সপ্তকন্যার কাহিনী

শশধর প্রকাশনী

১৯এ কেদার বসু লেন
ভবানীপুর
কলকাতা-৭০০০২৫

প্রকাশক ঃ রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১৯এ কেদার বসু লেন,
ভবানীপুর
কলকাতা-৭০০০২৫

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ মহালয়া

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ অমিয় ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ চয়নিকা প্রেস

মুদ্রণ ঃ অশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

বিনোদ বেরা

প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

॥ আমাদের আসন্ন প্রকাশিতব্য বই ॥

প্রেমের গল্প : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
দূর কভু দূর নহে : শঙ্কু মহারাজ

সপ্তকন্যার কাহিনী

॥ শশধর প্রকাশনীর সম্পূর্ণ বইয়ের তালিকা ॥

১।	চলচ্চিত্রের আবির্ভাব—জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (জাতীয় পুরস্কার রজত কমল প্রাপ্ত)	৩৫.০০
২।	ডিরোজিও—সম্পাদনা : রমাপ্রসাদ দে	২৫.০০
৩।	প্রসঙ্গ রামায়ণ—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫.০০
৪।	যত মত তত পথ—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫.০০
৫।	তত্ত্বসার—রামচন্দ্র দত্ত	২০.০০
৬।	আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২.০০
৭।	শুকসারী কথা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২০.০০
৮।	নির্ণয়—আশাপূর্ণা দেবী	১৫.০০
৯।	নরক-স্বর্গ-নরক—মায়া বসু	১২.০০
১০।	নীলদিগন্ত—মায়া বসু	২৫.০০
১১।	অমৃতধারা—তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়	১২.০০
১২।	স্ত্রী—কাহিনী : বিমল মিত্র, চিত্রনাট্য : সলিল দত্ত	১৫.০০
১৩।	চক্র-বক্র—বাণী রায়	১২.০০
১৪।	বাংলা কবিতা অর্দ্ধশতক—সম্পাদনা : দিনেশ দাস ও রামাপ্রসাদ দে	২৫.০০
১৫।	দশ দিগন্তে রবি—সম্পাদনা : রমাপ্রসাদ দে	১০.০০
১৬।	বরণীয় কবি স্মরণীয় কবিতা—সম্পাদনা : রমাপ্রসাদ দে	৬.০০
১৭।	বিংশতি কবিতা : ডিরোজিও অনুবাদ : রমাপ্রসাদ দে ও মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	৬.০০
১৮।	এক পাখি—রমাপ্রসাদ দে	৫.০০
১৯।	অনেক ক্ষতের চিহ্ন—রমাপ্রসাদ দে	৩.০০
২০।	কতকাণ্ড রেলগাড়ীতে—আশাপূর্ণা দেবী	৮.০০
২১।	সিনেমা আবিষ্কারের গপ্পো—জয়ন্ত ভট্টাচার্য	৮.০০
২২।	স্বর্গের বাহন—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২২.০০
২৩।	উত্তরায়ণ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫.০০
২৪।	দুই প্রান্ত—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০

আমাদের মনোরমা

আমাদের এই খেপুতে জগুদার চায়ের দোকান ছিল খুব বিখ্যাত। এই খেপুতে আরও দুটো চায়ের দোকান আছে, কিন্তু সেগুলো হলো রেস্টুরেন্ট। সে দুটোই বাজারের মধ্যে, একটা জুতোর দোকানের পাশে আর একটা বনশ্রী সিনেমা হলের গায়ে। সেখানে চায়ের সঙ্গে চপ-কাটলেটও পাওয়া যায়। সেই রেস্টুরেণ্টে ঢুকলেই পেঁয়াজ আর বাসি মাছের আঁশের গন্ধে কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে। টেবিলে ভন্‌ভন্‌ করে নীল রঙের ভুমো ভুমো মাছি, সেগুলো উঠে আসে কাঁচা নর্দমা থেকে। পয়সা খরচ করে মানুষ অমন নরকেও খেতে চায়।

আমাদের জগুদার চায়ের দোকান ছিল একদম আলাদা। এ দোকানের কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই। বাজার থেকে অনেকটা দূরে, একটা ছোটো টিনের ঘর, সেখানে চারটে নড়বড়ে কাঠের টেবিলের সঙ্গে আটখানা চেয়ার। তার আগে দু'খানা বেঞ্চি, দরজার কাছে আড়াআড়ি করে পাতা—বেশী ভিড় হলে খদ্দেররা সেখানে বসে। অবশ্য তেমন বেশী ভিড় হয় কালেভদ্রে।

জগুদার দোকানে শুধু চা নোনতা বিস্কুট ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না বেশীর ভাগ সময়। আর কেউ যদি সন্ধে ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে জগুদার দোকানে, তাহলে সে পেতে পারে তিরিশ পয়সার এক প্লেট মাংসের ঘুগনি। আহা, তার যা সোয়াদ, বহুক্ষণ জিভে লেগে থাকে। আমরা বাজি রেখে বলতে পারি অমন ঘুগনি বর্ধোমান বা কলকেতার কোনো দোকানেও কেউ পাবে না। তা আমাদের যখন ঈভিনিং ডিউটি থাকে, তখন আর ঐ ঘুগনি আমাদের ভাগ্যে জোটে না। ডিউটি শেষ করে বেরুতে বেরুতে রাত দশটা বাজে, ততক্ষণে ঐ ঘুগনি ফিনিশ। কত করে আমরা বলেছি, জগুদা, তোমার ঐ ঘুগনি একটু বেশী করে বানালেই পারো।

জগুদা ঘাড় নেড়ে বলেছে, না ভাই, তা হয় না। ওসব মাল একসঙ্গে বেশী রান্না করলে ঠিক সোয়াদটা আসে না। সে ম্যাড়মেড়ে বারোয়ারি তারের জিনিস হয়। তা ছাড়া খদ্দেরের মর্জির ওপর কী বিশ্বাস আছে? আজ তোমরা রাত দশটায় ঘুগনি খেতে এলে, কাল যদি না আসো? দোকানের মাল তাড়াতাড়ি

ফিনিশ হয়ে যাওয়াই বিজনেসের লক্ষ্মী!

জগুদার মাংসের ঘুগনির নাম ছিল প্যাঁটার ঘুগনি। শুধু খেপুত কেন, আশপাশের সাত-আটখানা গাঁয়ের কোন মানুষটা অন্তত একবার জগুদার দোকানের বিখ্যাত প্যাঁটার ঘুগনি খায় নি?

ইভিনিং ডিউটির পর আমরা অনেক সময় জগুদার দোকানে শুধু চা খেতেও আসতাম। বারো নয়া পয়সায় এক কাপ গুড়ের চা। জগুদা সবাইকে বলে দিতো, এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে সে চিনি দিতে পারবে না। তবে সেই গুড়ের সঙ্গে আদা-টাদা মিশিয়ে এমন চা বানাতো যে একদিন খেলে রোজ না খেয়ে উপায় নেই।

আমরা জিজ্ঞেস করতাম, কী জগাদা, তুমি কি চায়ে আফিং মেশাও নাকি? নইলে এত টানে কেন?

জগুদা হেসে বলতো, হ্যাঁ ভাই, আপিং বুঝি মাগ্‌না পাওয়া যায়? বারো নয়ার চায়ে আমি কি আপিং মিশিয়ে ফোত হবো?

জগুদার দোকানে ধারের কারবার নেই। কোনো খদ্দের এক কাপ চা নিয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকলেই জগুদা হাঁক দিতেন, এই মনো, টেবিল মুছে দে!

ঐটাই খদ্দেরকে উঠে যাওয়ার ইঙ্গিত।

পথ চলতে মানুষ অবশ্য জগুদার দোকানে বিশেষ আসে না। শনি মঙ্গলবারের হাটের দিনে তবু কিছু ভিড় হয়। আর বাদবাকি দিন আমাদের এই দেশলাই কারখানার ওয়ার্কাররাই আসে। কারখানার দরজা থেকে বিশ পা গেলেই জগুদার দোকান। তাও রাস্তা ছেড়ে খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে। দোকানের পেছনে দশ কাঠা জমি জগুদারই, সেখানে সে মটর ডাল আলুর চাষ করে। ঐ দোকানেরই লাগোয়া একখানা ঘরে জগুদার শোয়ার জায়গা।

এই দোকান আমরা দেখে আসছি আজ বিশ বছর ধরে। দোকানের অবস্থা একই রকম আছে, ক্ষতিও হয় নি, বৃদ্ধিও হয় নি।

বিয়ে-থা করে নি জগুদা। নিজের বলতে কেউ নেই। তবে বছর সাতেক আগে তার এক বিধবা মাসী এসে হাজির। সঙ্গে আবার বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ে। অবস্থার বিপাকে মাসীর ভিটেমাটি উচ্ছন্নে গেছে, দুমুঠো অন্ন জোটে না। তাই জগুদার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল।

জগুদা তাদের ফেলে দেয় নি একেবারে। দোকানের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। মাসীর মেয়েটি হয়ে গেল দোকানের বয়। এর আগে জগুদা নিজের খদ্দেরের

টেবিলে চা এনে দিতো, তখন থেকে সেই মেয়েটা এনে দেয়। আর মাসী বাসন-পত্তর মাজে, ঘর মোছে, খেতের কাজ দেখে। অনেকদিন বাদে জগ্‌দার ভাগ্যে খানিকটা আরাম জুটলো। মাঝে-মাঝে জগ্‌দা নিজেও এক কাপ চা নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে গল্প করতে বসতো।

আড়াই বছর বাদে সেই মাসী মারা গেল ওলাওঠায়। আমরাই কাঁধ দিয়ে মাসীকে পুড়িয়ে এসেছিলাম নদীর ধারে।

মাসীর মেয়ের নাম মনোরমা। এর মধ্যেই সে দোকানের কাজ বেশ শিখে নিয়েছে। ঠিক জগ্‌দার মতনই চা বানায়। তার হাতের প্যাঁটার ঘুগনি বুঝি জগ্‌দার থেকেও বেশী স্বাদের। আর পয়সা-কড়ির হিসাবেও বেশ পাকা। জগ্‌দা তার ওপরে দোকানের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি।

মনোরমার বয়েস আর কতই বা, বড় জোর পনেরো-ষোল, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন প'চিশ-ছাব্বিশ। বেশ লম্বা, বড়-সড় চেহারা। একটু মোটার দিকে ধাত। রংটা তো বেশ কালোই, তার ওপর আবার ছেলেবেলায় পান বসন্ত হয়েছিল বলে মুখে একটা পোড়া পোড়া ভাব। মনোরমার গলার আওয়াজটা অনেকটা ছেলেদের মতন। লোকের মুখে মুখে চটাস্ চটাস্ করে কথা বলে সে।

জগ্‌দা আর মনোরমা তখন থেকে সেই দোকানঘরেই একসঙ্গে থাকতো বলে কেউ কেউ অকথা-কুকথা বলতে শুরু করেছিল। লোকের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। সব সময় জিভ সুড়সুড় করে, একটা কিছু পেলেই হলো। মনোরমার মতন সোমত্ত মেয়ে রাত্তির বেলায় জগ্‌দার মতন একটা পুরুষমানুষের কাছাকাছি শোয়—নিশ্চয়ই এর মধ্যে মন্দ কিছু থাকবে। হোক না মাসীর মেয়ে—কী রকম মাসী তাই বা কে জানে।

এসব কথা জগ্‌দার কানে আসার পর সে দুঃখ পেয়েছিল। আমরা যারা পুরনো খদ্দের, আমাদের কাছে আপসোস করে বলেছিল, আচ্ছা তোমরাই বলো দিকিনি, এমন পাপ কথাও লোকের মনে আসে? মেয়েমানুষে আমার অরুচি, নইলে এতগুলো বছর গেল একটা কি বিয়ে-থা করতে পারতুম না? ছি ছি ছি, ঘেন্না—নিজের মাসতুতো ভগ্নী, তাকে নিয়ে এমন কথা! মেয়েটা এখানে শোবে না তো কোথায় শোবে? ও মেয়েকে যদি কেউ বিয়ে করতে চায়, আমি এক্ষুনি বিয়ে দিতে রাজী আছি। ধার দেনা করেও বিয়ে দেবো। তোমরা দ্যাখো না; কোনো পাত্তর আছে?

না, মনোরমার বিয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়। তার পোড়া পোড়া মুখে

বসন্তের দাগ—তাকে কে বিয়ে করবে? তা ছাড়া, মনোরমার অমন দশাসই চেহারা, তার সঙ্গে মানাবে এমন জোয়ান মদ্দই বা কোথায়?

আমি, রতন, পরাণ আর জিতেন—আমরা ডিউটি সেরে রোজই একবার জগুদার চায়ের দোকানে যাই। আমরা জানি, জগুদা মানুষটা মন্দ না। মেয়েমানুষের দিকে তার টান নেই সত্যিই, নইলে এতগুলো বছরের মধ্যে একদিনও তো অন্তত একটা খিস্তি-খেউড় শুনতে পেতুম না ওর মুখে।

তা, জগুদা আর মনোরমাকে নিয়ে বদনামটা রটবার পর কিন্তু জগুদার দোকানে ভিড় বেশ বেড়ে গেল! এক একসময় এসে আমরাই জায়গা পাই না। মনোরমার মুখখানা নাই বা সুন্দর হলো তার জামা উপছোন বুক আর ভারী পাছার দিকে নতুন খদ্দেররা হ্যাংলার মতন তাকিয়ে থাকে। তারা দু'কাপ-তিন কাপ করে চা খায়। বাজারের দুটো রেস্টুরেণ্টের কোনোটাতেই তো কোনো মেয়ে এসে চা দেয় না।

এত খদ্দের বেড়ে যাওয়ায় জগুদা কিন্তু খুশি হয় নি। তার নিরিবিলি দোকানের বাঁধা খদ্দেরই পছন্দ। অচেনা খদ্দেররা কখনো একটু বেশী চেঁচিয়ে কথা বললে জগুদা হাঁক দেয়, আস্তে আস্তে, এটা হাটবাজার নয়।

যাই হোক, তবু তো বেশ চলছিল! এর মধ্যে জগুদা একটা মহা নির্বুদ্ধিতার কাজ করল। এক বছর প্রথম বর্ষার শুরুতে জগুদা একদিন হুট্‌ করে মরে গেল। মেয়ের কি দশা হবে, সেটা একবার ভাবলো না পর্যন্ত।

সেদিন আমাদের নাইট ডিউটি ছিল। নাইট ডিউটি শেষ হয় ভোর সাড়ে পাঁচটায়—ডিউটি সেরে আমরা ক'জন, না, সেদিন পরাণ ছিল না, তার বদলে আমাদের সঙ্গে ছিল পঞ্চু—গুটি গুটি এলাম জগুদার দোকানে। এমন অনেকবার হয়েছে, আজ ভোরে জগুদার দোকানের ঝাঁপ ওঠেনি, আমরাই ডেকে তুলে উনুনে আঁচ দিয়েছি। অসময়ে এলেও জগুদা অসন্তুষ্ট হতো না।

সেদিন এসে দেখি মনোরমা মড়াকান্না কাঁদতে বসেছে। ও দাদা, দাদাগো—বলে সুর টেনে চলেছে মনোরমা। তাকে এর আগে আমরা তো কখনো কাঁদতে শুনিনি, তার মায়ের মৃত্যুর সময়েও সে চেঁচিয়ে কাঁদে নি—সেইজন্যই তার ভাঙা ভাঙা গলা শুনে আমরা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

ওপাশের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখি মেঝের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে আছে জগুদা। চোখ দুটো খোলা, ওরে বাবারে, সে রকম চোখ দেখলেই ভয় করে! পঞ্চু নিচু হয়ে জগুদার গায়ে হাত ছুঁয়ে বললো, এ তো একেবারে ঠাণ্ডা কাঠ।

অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে।

পাশাপাশি দুটো বালিশ। জগুদা আর মনোরমা পাশাপাশি শুতো তাহলে। সেমিজের ওপরে একটা আলুথালু শাড়ি জড়িয়ে মনোরমা হাপুস হয়ে কাঁদছে। আমি অন্যদের অলক্ষ্যে মনোরমার বালিশটা পা দিয়ে ঠেলে ঘরের কোণের দিকে সরিয়ে দিলাম। এরপর পাঁচটা লোক আসবে, তারা এ নিয়ে আবার পাঁচ রকম কথা বলবে, কী দরকার।

শরীরে কোনো রোগ ব্যাধি ছিল না জগুদার। তবু এমন করে মরে গেল কেন? সবাই বললো, সন্ন্যাস রোগ। ও রোগে মানুষ এমনিই রাত্তিরবেলা নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ চলে যায়। আমাদের পঞ্চু বললো, জগুদার নিশ্চয়ই হার্ট উইক হয়ে গেশ্‌লে। হোমিওপ্যাথিতে এর ভাল চিকিচ্ছে আছে। আহা, আগে জানলে—

যাই হোক, আমরা সবাই মিলে তো জগুদাকে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এলুম। কিন্তু এবার মেয়েটার কী গতি হবে? সেই কথা বলেই মনোরমা কাঁদছিল। ও মা গো, আমি এখন কোথায় যাবো গো! আমি কার কাছে যাবো!

দু'তিন দিন তো এই ভাবে কাটলো। আমরা রোজই আসি। চা বন্ধ, কিন্তু এই দোকানটাতে আসাটাই যে আমাদের নেশা। গত কুড়ি বছর ধরে আসছি, হঠাৎ কি না এসে পারা যায়?

শেষে আমরাই মনোরমাকে পরামর্শ দিলাম, তুই আবার দোকান খোল দিদি। তোকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে, এই দোকানই তোর ভরসা। তা ছাড়া এই দোকানটাই ছিল জগুদার প্রাণ, এটাকে বাঁচিয়ে না রাখলে যে জগুদার আত্মা তৃপ্তি পাবে না!

ছ'দিনের মাথায় মনোরমা চোখের জল মুছে আবার দোকানের ঝাঁপ তুললো। আবার খদ্দের আসতে লাগলো। জগতে কেউ কারুর জন্যে বসে থাকে না। অমন যে জবরদস্ত হাসি-খুশি মানুষটা ছিল জগুদা, সে চলে যাওয়ায় কিছুই ঘাটতি পড়লো না, কিছুই থেমে থাকলো না।

তবে ধন্য সাহস বটে মনোরমার। ঐ মাঠের মধ্যে দোকানঘরে সে একলা থাকে। যে ঘরে জগুদা মরেছে, সেই ঘরেই সে এখন একলা শোয়, একটুও ভয়-ডর নেই তার। আমরা বলেছিলুম কোনো একটা বুড়ি মেয়েমানুষকে ওর কাছে রাখতে। কাজকম্মেও সাহায্য হবে, রাত্তিরেও কাছে থাকবে। মনোরমা বলেছে, তার কোনো দরকার নেই। একটা লোক রাখা মানেই তো বাড়তি খরচ।

এক বচ্ছর কেটে গেছে, এর মধ্যে একদিনের জন্যেও একটা চোর পর্যন্ত ঢোকে নি ঐ দোকানঘরে। আমাদের এদিকে চোরছ্যাঁচোড়গুলোও সব রোগা প্যাংলা, তাদের এমন সাহস নেই যে মনোরমার মতন অমন খাণ্ডারনী মেয়েমানুষের ঘরে ঢোকে। মনোরমার এখন ভারভাত্তিক চেহারা, দেখে কেউ ওর বয়স বুঝবে না। আমরা জানি, ওর বয়েস বাইশ। কিন্তু লোকে ভাববে বত্রিশ।

অ্যাদ্দিন কোনো সাইনবোর্ড ছিল না, এখন মনোরমা দোকানের সামনে এক সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। 'জগুদার চায়ের দোকান'। জগুদা এখন নেই, তবু দোকানের সঙ্গে তার নামটা টিকে গেল।

দোকান বেশ ভালই চালাচ্ছে মনোরমা। আমরা ক'জন হলুম গে তার গার্জেন। আমরা সবচেয়ে পুরোনো খদ্দের, আর বলতে গেলে জগুদার বন্ধুই ছিলাম, তাই আমাদের সে অধিকার আছে। মনোরমাও আমাদের তেমনভাবেই মান্য করে। আমাদের পরামর্শ-টরামর্শ মন দিয়ে শোনে। রোজ একবার করে আমরা খবর নিতে আসি। আমি, তরুণ, পরাণ আর জিতেন, মাঝে মাঝে পণ্টুও এসে আমাদের সঙ্গে জোটে।

আমাদের দেশলাই কারখানায় তিনরকমের ডিউটি। ডে, ইভনিং আর নাইট। আমাদের কোন সপ্তায় কখন ডিউটি থাকবে, তা পর্যন্ত মনোরমার মুখস্থ। সেই অনুযায়ী সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। কখনো যদি আমাদের চারজনের এক শিফ্‌টে ডিউটি না পড়ে, তাহলে হয় গণ্ডগোল। তখন আর একসঙ্গে আসা হয় না। তবু একবার করে ঘুরে যাই সবাই।

একহাতে দোকান চালাবার ক্ষমতা রাখে বটে মনোরমা। সে-ই চা বানাচ্ছে, সে-ই ঘুগনি রাঁধছে, সে-ই টেবিল পরিষ্কার করছে। আজকাল আবার সে মামলেটও বানায়। নোনতা বিস্কুট ছাড়া, সে একটা কাচের বোয়ামে কেকও এনে রেখেছে।

এক এক সময় আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি তার কেরামতি। কোনো একটা খদ্দের একটা অচল আধুলি দিয়েছিল। এক পেলেট ঘুগনি আর এক কাপ চা খেয়ে সে খুচরো আট নয়া পয়সা ফেরত চাইলো না। বাবুগিরির কায়দায় সে মনোরমার সামনে আধুলিটা রেখে বললো, খুচরোটা তুমিই নিও!

সে খদ্দের দোকানের দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই মনোরমা ছুটে গিয়ে তার কাছা ধরেছে। কড়কড়ে গলায় মনোরমা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ওরে

আমার ভালমানুষের ছেলে! আমি কি তোমাকে নকল খাবার দিয়েছি যে তুমি আমাকে নকল পয়সা চালাচ্ছ?

খদ্দের যেন কিছুই জানে না; আমসিপানা মুখটি ভরে বললো, নকল পয়সা! কে বলেছে? এই তো আমি সিগ্রেটের দোকান থেকে একটু আগে ভাঙিয়ে আনলাম!

মনোরমা আধুলিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, সে তুমি সিগ্রেটের দোকানদারের সঙ্গে বোঝ গে। আমার খাঁটি জিনিসের খাঁটি পয়সা দিয়ে যাও!

পয়সাটা মাটিতে পড়ে ঠং করে শব্দ পর্যন্ত হলো না।

খদ্দের পকেট উল্টে বললো, আর তো পয়সা নেই!

—খাবার বেলা সে কথা মনে ছিল না?

আমরা চারজন কোণের টেবিলে বসে মিটিমিটি হাসছি। আমরা তো জানিই, ও খদ্দের ব্যাটা বেশী ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে তক্ষুনি গিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরবো। আমরা মনোরমার গার্জেনরা এখানে বসে আছি। ও ভেবেছে মনোরমা অবলা মেয়েছেলে!

আমাদের সে রকম কিছু করবার দরকার হলো না। মনোরমা নিজেই দোকানের বাকি খদ্দেরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, আপনারাই পাঁচজনে বলুন, আমি খেটেখুটে দোকান চালাচ্ছি, কোনো দিন কারুকে খারাপ জিনিস দিইনি—কাল দুটো পচা ডিম বেরুল, তাও আমি প্রাণে ধরে ফেলে দিলুম—আর আমাকে এরকমভাবে লোকে ঠকাবে? এই কি ধর্ম?

যে-সব নতুন খদ্দেররা মনোরমার গতর দেখতে আসে, তারা সঙ্গে সঙ্গে বললে, খুব অন্যায়! নিশ্চয়ই ওর ট্যাঁকে আরও পয়সা আছে।

মনোরমা তখনো লোকটার কাছা টেনে ধরে আছে। লোকটার তখন কাঁদো কাঁদো অবস্থা। মনে হয় কোনো সাধারণ হাটুরে লোক। তা বলে ওকে ছেড়ে দেবার কোনো কথাই ওঠে না।

পরাণ হাঁক দিয়ে বললে, ওর জামা খুলে নে, মনো!

লোকটা হাতজোড় করে বললে, আমাকে আজ ছেড়ে দিন। আমাকে একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যেতে হবে। আমি কাল ঠিক এসে পয়সা দিয়ে যাবো!

শ্রাদ্ধবাড়ির কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রতন বললে, ব্যাটা শ্রাদ্ধবাড়িতে যাবি তো জুতো পরে যাবার দরকার কি? জুতো জোড়া খুলে রেখে যা!

লোকটার পায়ে প্রায় নতুন এক জোড়া রবারের পাম্পশু। জামার বদলে শেষ পর্যন্ত জুতো জোড়া খুলে রেখে লোকটা নিস্তার পেলো। সে লোকটা আর জুতো নিতে আসে নি। জুতো জোড়া পড়েই ছিল দোকানে, শেষ পর্যন্ত আমাদের কারখানার দারোয়ান দেড় টাকা দিয়ে সে দুটো কিনে নিলো।

আর একবার একটা লোক নাকি দুপুর দুপুর এসে ইচ্ছে করে মনোরমার গায়ে হাত দিয়েছিল। পয়সা দেবার সময় ইচ্ছে করে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একেবারে মনোরমার বুকের ওপর। ঘটনাটি আমি নিজের চোখে দেখিনি, রতনের মুখে শুনেছি। আমাদের মধ্যে শুধু রতন ছিল দোকানে।

রতন লাফিয়ে উঠে গিয়ে লোকটার ঘাড় চেপে ধরেছিল। তাকে ঠেলতে ঠেলতে দোকানের বার করে দিচ্ছিলো, সেই সময়ে মনোরমা এসে বলেছিল, দাঁড়াও রতনদা, এ লোকটার বেশী রস উথলে উঠেছে, একটু শিক্ষা দিয়ে দিই! এই বলে মনোরমা লোকটার নাকে এমন ঘুষি মারলো যে রক্ত বেরিয়ে গেল। মনোরমার ঐ গোদা হাতের মার সহ্য করার ক্ষমতা আছে কার?

মনোরমা লোকটাকে সেই অবস্থায় দোকানের বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ফের যদি এদিকে আসিস তোর একটা হাড়ও আস্ত রাখবো না। গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে দেবো মুখে, বুঝলি।

এর পর থেকে রসিক ছোকরারা শুধু চাউনি দিয়ে মনোরমার গা চেটেই যা সুখ পায়, ধারে কাছে ঘেঁষতে আর সাহস করবে না কেউ।

জগুদার সঙ্গে মনোরমার একটা ব্যাপারে মিল আছে। বেশী খদ্দের টেনে বেশী লাভ করার দিকে তারও লোভও নেই। বাছাই করা খদ্দের নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট দোকান চালাতেই সে চায়। সে খাঁটি জিনিস দেবে। তার বদলে ভেজাল খদ্দের তার দরকার নেই।

যে যে হপ্তায় ইভিনিং ডিউটি থাকে, সেই সব সময়েই জগুদার দোকানে আমরা বেশীক্ষণ কাটাই। ডিউটি শেষ হয় রাত ন'টায়—কোনো কোনোদিন সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে আসি। আট ঘণ্টা ডিউটির পর আমাদের শরীর ক্লান্ত থাকে, তবু তখুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় কোথাও নিরিবিলিতে বসে একটু সুখদুঃখের গল্প করি।

তা রাত ন'টার পর জগুদার দোকান একেবারে নিরিবিলিই হয়ে যায়। লাস্ট বাস চলে যায় ন'টা দশে, তারপর এ রাস্তায় তো আর মানুষজন থাকেই না বলতে গেলে। মনোরমা আমাদের ডিউটির সময় জানে; আমরা দোকানে ঢুকে

বসবার সঙ্গে সঙ্গে সে চা এনে দেয়। অ্যাসট্রের ছাই ফেলে পরিষ্কার করে আনে। তারপর সে ক্যাশের সামনে বসে সারাদিনের হিসেব করতে বসে। সেই সময় সে আপন মনে গান গায়।

মনোরমার গান ভারি অদ্ভুত। তার গলা ভাল না। কথা বলার সময় তার গলাটা পুরুষমানুষের মতন হেঁড়ে হেঁড়ে মনে হয়। কিন্তু গান গাইবার সময় সে একটা অদ্ভুত সরু গলা বার করে, অনেকটা কুকুরের কুঁই-কুঁই-এর মতন। যে কুকুর ঘেউঘেউ করে সেই কুকুরই তো আবার কুঁইকুঁই করে এক সময়। মনোরমাও সেই রকম। আর রোজ সে একই গান গায়ঃ

যে জ্বরে জ্বরেছে মা, তোর কানাই
মা, তোমায় কেমনে জানাই
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

শুধু ঐটুকুই আর বেশী না। ঐ ক'টা লাইনই বারবার ঘুরে ফিরে গায়। এই অদ্ভুত গান। এই অদ্ভুত গান কোথা থেকে সে শিখল তাও জানি না।

রতন জিজ্ঞেস করে, আজ কত বিক্কিরি হলো, মনোদির ?

মনোরমা উত্তর দেয়, সাতাশ টাকা তিরিশ নয়া। তা ভালই হয়েছে।

যেদিন বিক্কিরি অনেক কম হয়, সেদিন সে কোনো আফসোস করে না। রোজই পয়সা গোনার সময় সে এ রকম সন্তুষ্টভাবে গান গায়।

এক একদিন সে আমাদের জন্য ঘুগনি বাঁচিয়ে রাখে। বিশেষ করে শনিবার। মনোরমা জানে। রবিবার আমাদের অফ ডে, তাই শনিবার রাত্রে স্ফূর্তি করি। চায়ের কাপ নিয়ে আমরা চুপচাপ বসে থাকি এক কোণের টেবিলে। কোনো কথাও বলি না। শেষ খদ্দেরটি চলে যাবার পর আমরা আড়মোড়া ভাঙি। তখন রতন বলে, মনো দিদি, চারটে গেলাস দিবি ?

মনোরমা আমাদের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে জাঁদরেল ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, এখন বুঝি ঐ সব ছাই-ভস্ম খাওয়া হবে আবার ?

আমাদের একজনের পকেট থেকে একটা বাংলার পাঁইট বেরোয়। আমরা বলি, এই তো এইটুকুনি, এতো এক চুমুকেই শেষ হয়ে যাবে।

মনোরমা বলে, ঠিক ? আর বেশী খাবে না ?

—না, দিদি আর পাবো কোথায় ?

আমরা মনোরমার গার্জেন। কিন্তু এই সময় সে-ই আমাদের ওপর গার্জেনি করে। আমাদের প্রত্যেকের পকেটেই যে একটা করে পাঁইট আছে, সে কথা

জানতে দিই না ওকে।

মনোরমা চারটে গেলাস নিয়ে আসে। নাক সিঁটকে বলে, ইঃ কী বিচ্ছিরি গন্ধ! তোমরা এসব খেয়ে যে কী আনন্দ পাও!

—তুই একটু খাবি নাকি? তাহলে তুইও আনন্দ পাবি!

—রক্ষে করো! আমার আর আনন্দ পেয়ে দরকার নেই। আমি বেশ আনন্দে আছি!

প্রত্যেক শনিবার ঠিক এই একই কথা হয়। প্রত্যেকবারেই আমরা এতে আনন্দ পাই। মনোরমা আমাদের জন্যে চার প্লেট ঘুগনি নিয়ে আসে। তখনো গরম। আমাদের জন্যে যত্ন করে ঘুগনিটা আবার গরম করেছে, এই জেনে বেশ সুখ হয়।

মনোরমা কিচেনে গেলেই আমরা পকেট থেকে বোতল বার করে আবার গেলাসে ঢেলে নিই। ক্রমে ক্রমে নেশা ধরে, আমাদের চোখ চকচকে হয়ে আসে, কপালে বিনবিন করে ঘাম। পরাণ একটু গান ধরতে গেলেই জিতেন তাকে ধমকে ওঠে, চোপ! তুই গান গাইবি না। এখন আমরা মনোরমার গান শুনবো।

রতন বলে, মনো, আমাদের কাছে একটু আয় না দিদি।

মনোরমা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তোমরা আর কত দেরি করবে?

—এই তো হয়ে এলো, আর একটু বাদেই চলে যাবো। আয় না, আমাদের কাছে এসে একটু বোস, দুটো কথা বলি!

মনোরমা একটা চেয়ার টেনে এনে বসে। একটু দূরে, যাতে বাংলার গন্ধটা তার নাকে না যায়।

জিতেন বলে, ধর তো মা তোর ঐ গানটা!

মনোরমা অমনি তার সেই গান ধরে, এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই—

বারবার শুনতে শুনতে আমাদের ঘোর লেগে যায়। মনে হয়, আহা, কী অপূর্ব গান! এমনি কখনো শুনিনি! পরাণ টেবিল চাপড়ে তাল দেয়। রতন আহা আহা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে।

—মনো, তুই নাচ জানিস না দিদি?

মনো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দেখবে? আমার নাচ দেখবে?

অমনি সে দু'হাত দুপাশে ছড়িয়ে চোখ বুজে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। ঠিক আনি মানি জানি না খেলার মতন। এই রকম বোঁ বোঁ করে ঘোরাকে যে

কেন ও নাচ বলে, তা আমরা বুঝি না। তবু প্রত্যেক শনিবার আমরা মনোরমাকে নাচতে বললেই সে এ রকম ঘোরে।

তখন মনোরমাকে বড় সুন্দর লাগে আমাদের। হোক না সে কালো, বসন্তের দাগওয়ালা পোড়া পোড়া মুখ, হাত-পাগুলো মুগুরের মতো, আর বিরাট বিরাট দুই বুক আর পাছা—তবু সুন্দর দেখায় তাকে।

মনোরমার নাচের সময় আমরা চারজন উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ি। ওর নাচটা আমাদের খেল। আমরা বয়স্ক চারজন লোক সেই সময় খেলায় মেতে উঠি। আমরা দূর থেকে বলি, মনো, আমাদের ধর দেখি!

মনোরমা ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাদের একজনের গায়ের উপর পড়ে। সে তখন টুঁ শব্দটি করে না। তখন মনোকে বলতে হবে, সে কাকে ছুঁয়েছে।

মনোরমা চোখ না খুলেই তার গায়ে হাত বুলোয়। থুতনি ধরে নাড়ে, দুষ্টুমি করে কান দুটো টানে, তারপর চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ও এ তো বঙ্কুদা!

মনোরমা যখন আমাকে ধরে এ রকম গায়ে মুখে হাত বুলোয় আমার শরীরটা একেবারে জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে হয়, মনোরমা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে চিনতে না পারুক!

অন্যরা তখন হিংসে হিংসে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। এক রাত্তিরে এই খেলা দু'বার খেলে না মনোরমা। সুতরাং একজনেরই ভাগ্যে শুধু মনোরমা আসে এক এক শনিবারে।

আমাদের বাড়িতে বউ ছেলেপুলে আছে। বুড়ি মা আছে, অভাব আছে, ফুটো টিনের চাল আছে। পোকা লাগা বেগুন আছে। আর অনেক কিছুই নেই। বাড়িতে গেলেই তো শুনতে পাই হ্যানো নেই, ত্যানো নেই। কিন্তু শনিবার রাত্তিরে এ সময়টা আমরা সেসব কিছু ভুলে যাই। তখন শুধু আমরা চারজন আছি, আর মনোরমা।

ছেলে ছোকরারা হাতে পয়সা পেলেই বাজারের সিনেমা হলে ছোটে। সেখানে ধর্মেন্দর আর হেমা মালিনীর জাপটা-জাপটি দেখে তারা কী সুখ পায় কে জানে। আমাদের সিনেমা হলটাও হয়েছে এমন, হপ্তায় দু'বার করে বই পাল্টায়। আমরা ওসব দেখতে যাই না কখনো। আমাদের মনোরমা আছে।

রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। মনোরমা বলে, ওগো, তোমরা বাড়ি যাবে না? এর পর বাড়ি গেলে যে বউ তোমাদের প্যাঁদাবে।

আমরা হাহা করে হেসে উঠি। মনো এমন মজার কথা বলে। আমরা

জানি, মনোরমা এর পরই একটা গল্প বলবে। প্রত্যেক শনিবারই বলে। বর্ধমানে ওরা কিছুদিন এক কাকার বাড়িতে ছিল। সে বাড়ির ওপরতলায় থাকতো এক ভদ্রলোক আর তার বাঁজা বউ। ভদ্রলোকটি রোজ রাত্তিরে মাল টেনে আসতো আর বাড়ির দরজায় ঢুকেই বলতো, আর করবো না, আর কোনোদিন করবো না! কিন্তু তার বউ তখুনি ছুটে এসে তাকে দুমদাম করে মারতো। সে কি মার! অনেক দূর থেকে সেই শব্দ শোনা যায়। লোকে শুনে ভাবে, ছাদ পেটাই হচ্ছে?

গল্প শুনে আমরা হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ি। প্রত্যেক শনিবার। জিতেন পেট চেপে ধরে বলে, থাম, মনো থাম, আর বলিস না! ওসব ভদ্রলোকদের কথা আর বলিস না! টাকা রোজগার করে যে বউকে খাওয়াবে আবার সেই বউয়ের হাতে মারও খাবে এসব ভদ্রলোকেরাই পারে!

পরাণ বলে, মনো, আমাদের মতো কেউ যদি তোকে বিয়ে করতো, তুই তাকে মারতিস!

মনোরমা বলে, মারতাম না আবার! মেরে একেবারে পাট করে দিতাম!

রতন বলে, ভাগ্যিস আমি তোকে বিয়ে করিনি! তোর হাতের মার খেলে আমি মরেই যেতাম!

রতন এক-এক দিন নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি বার করে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ উ-হু-হু করে ওঠে। তারপর বলে, ইস্ পায়ে খিল ধরে গেল। মনো, একটু টেনে তোল তো আমাকে!

মনোরমা এসে তাকে টেনে তুলতেই সে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরে। ঠিক যেন বাতের রুগী। কিন্তু ওসব চালাকি কি আর আমরা বুঝি না!

পরাণ আজ বলে, আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। কি রে বঙ্কা, তোর ধরেনি? জিতেন?

আমরা বলে উঠি, হ্যাঁ, আমাদেরও পায়ে খিল ধরেছে। আমরা তো একসঙ্গে বসে আছি।

জিতেন বলে, রতনকে মনো টেনে তুলেছে। আমাদেরও টেনে তুলবে!

মনো হেসে ফেলে বলে, তোমরা সব বুড়ো খোকা! তোমাদের নিয়ে আর পারি না! এবার যাও, নইলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো বলছি!

ব্যস, ঐ পর্যন্ত। ওর বেশী আর আমরা এগোই না। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। আমাদের তো ঘরসংসার আছে। একটা করে বাড়ি আছে।

সে বাড়িতে কত কিছুই নেই। আমরা বেরিয়ে আসার পর মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। আমরা চারজন পাশাপাশি হাঁটি।

এক সময় রতন বলে, আমাদের মনো বড় ভালো মেয়ে!

আমরা বাকি তিনজন তখন ঐ এক কথাই ভাবছিলাম।

রতন বলে, এমন ভালো মেয়ে, অথচ তার একটা বিয়ে হলো না! মেয়েটা সারাজীবন এ রকম কষ্ট পাবে?

আমরা আমাদের মনের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি। মনোরমার সঙ্গে বিয়ে দেবার মতো কোনো পাত্রের কথা আমাদের মনে পড়ে না।

রতন কাঁদতে আরম্ভ করে। একটু নেশা হলেই কান্নাকাটি করা রতনের স্বাভাব। ফোঁপাতে ফোঁপাতে এক সময় সে বলে, আমি যদি আগে বিয়ে না করে ফেলতাম, তাহলে আমিই মনোকে বিয়ে করতাম। একথা নিশ্চয় করে বলছি। আহা মনোরমার হাতে মার খেয়েও আমার সুখ হতো—।

বলতে বলতে রতন হঠাৎ থেমে যায়। আমাদের চোখের দিকে তাকায়। আমরা ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আছি। রতনটা স্বার্থপরের মতো কথা বলছে। আমরাও তো ভুল করে ফেলেছি আগে। আমাদেরও বাড়িতে প্যানপেনে, রোগা-পটকা, অসুখ-ভোগা, হাড়-জ্বালানি বউ আছে। তার বদলে মনোরমাকে বিয়ে করলে অনেক বেশী সুখ হতো। কিন্তু একজন কেউ বিয়ে করলেই তো মনোরমা শুধু তার হয়ে যেতো। বঞ্চিত করা হতো আর তিনজনকে। তখন কি আর অন্য কেউ পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে বলে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরতে পারতো?

না! আমরা আগে বিয়ে করেছি, ভালোই হয়েছে। আমরা কেউ আর মনোরমাকে বিয়ে করতে পারবো না। সেই জন্যেই, মনোরমা আমাদের চারজনের হয়ে থাকবে। তাই তো আমাদের আড্ডায় পঞ্চুকেও সঙ্গে আনি না!

আমাদের দেশলাই কারখানায় দুম করে পাঁচজন লোক ছাঁটাই হয়ে গেল। তার মধ্যে আমরা কেউ পড়িনি বটে কিন্তু শুনছি আরও ছাঁটাই হবে। কখন কার ওপর কোপ পড়বে তার ঠিক নেই। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। বাজার খুব মন্দা! ম্যাড্রাস থেকে সস্তা দামের দেশলাই এসে বাজার ছেয়ে ফেলেছে।

ডিউটি শেষ করে বেরুবার সময় মুখটা তেতো লাগে। প্রত্যেকদিন ভয় হয়, কাল এসে কী নোটিস ঝুলতে দেখবো কে জানে। আবার কেউ কেউ বলছে লক

আউট হবে!

ব্যাজার মুখ করে জগুদার চায়ের দোকানে আসি। মনোরমা দোকানটাকে বেশ দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্রায়ই সে বলে, দোকানের জন্যে এবার সে ফার্নিচার করবে। চেয়ার টেবিলগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে, কয়েকখানা না বদলালেই নয়।

আমরা মনোরমাকে ঠাণ্ডা মাথায় উপদেশ দিই। এক্ষুনি হুট্ করে কিছু করে ফেলিস না দিদি! দিন কাল ভালো নয়। হাতে পয়সা থাকা ভালো।

মনোরমা বলে, তোমরা আজকাল এত গোমড়া মুখে থাকো কেন গো? বুঝি এ দোকানের চায়ে স্বাদ নেই?

আমরা হাহা করে উঠি। সে কি কথা! মনোরমার চায়ের হাত দিন দিন মিষ্টি হচ্ছে। গুড় দিতে ভুলে গেলেই মিষ্টি।

আমরা মনোরমার দোকানে কখনো ধার রাখি না এ নিয়ম সেই জগুদার আমল থেকে চলে আসছে। ধার রাখলেই ধার জমে যায়—পরে আর শোধ করা হয় না। ধার রাখলেই দোকানের মালিকের সঙ্গে ভাব নষ্ট হয়। আমরা চারজন এখন মনোরমার গার্জেন, কিন্তু কেউ বলুক দেখি কোনো একদিনও ওর দোকানে মিনিমাগনায় খেয়েছি! হাতে পয়সা না থাকলে সেদিনটা আর দোকানেই আসি না। তবে, আমরা সকলেই জানি। আমাদের একজন না গেলেও অন্য তিনজন যাবে, মনোরমার দেখাশোনা করে আসবে।

তবে শনিবারের আড্ডায় কেউ বাদ পড়ে না। কারখানার ফোরম্যানকে ঘুষ দিয়ে হাত করা আছে, কোনো রবিবার আমাদের নাইট ডিউটি দেবে না!

শনিবার দিন পকেট থেকে আমরা মালের বোতল বার করলে প্রত্যেকবার মনোরমা বকাঝকা করে। কিন্তু আমরা জানি, শনিবারের এই মজাটুকু মনোরমাও পছন্দ করে খুব, সারা হপ্তা মনোরমাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটে, ওর তো জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। আমাদের সঙ্গে ঐটুকু খেলাধুলোই ওর ফুর্তি।

তা এক শনিবার আমরা অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছি, শেষ লোকটা আর কিছুতেই ওঠে না। লোকটা এক টেবিলে একা বসে আছে, একটা হাত থুতনিতে, কী যেন ভেবেই চলেছে। রোগা লম্বাটে চেহারা লোকটার জামা-কাপড় বেশ ফর্সা। একে আগে কখনো দেখিনি। প্রথমে ভেবেছিলাম, লোকটা বুঝি মনোরমার দিকে হ্যাংলা দৃষ্টি দিচ্ছে, তারপর বুঝলাম, তা না, লোকটার

চোখ শুধু দেয়ালের দিকে—সে অন্য কিছুই দেখছে না।

আমাদের এ দোকান থেকে বিনা দোষে কোনো খদ্দেরকে কখনো তাড়িয়ে দিই না। কেউ যদি একটু বেশীক্ষণ বসতে চায় বসুক না! কিন্তু লোকটা এক কাপ মাত্র চা নিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

রতন গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, ক'টা বাজলো!

পরাণ বললো, ন'টা বেজে গেছে!

জিতেন বললো, লাস্ট বাস এক্ষুনি চলে যাবে বোধহয়!

আমরা ভাবলাম, যদি এসব কথা শুনে লোকটা উঠে পড়ে। ভিনদেশী লোক, লাস্ট বাস চলে গেলে ফিরবে কী করে?

লোকটা এসব কথা শুনেও উঠলো না। বরং টেবিলের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো। আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। এ আবার কী ব্যাপার!

আমরা মনোরমাকে চোখের ইশারা করলাম। মনোরমা লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই ক্যারকেরে গলায় বললে, আপনি চা খাবেন না? এ তো অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

লোকটা কোনো কথা না বলে শুধু মুখ তুলে মনোরমার দিকে তাকালো।

মনোরমা আবার বললে, আমি এবার দোকান বন্ধ করবো।

লোকটাকে আস্তে আস্তে বললো, আমি এই টেবিলের ওপর শুয়ে থাকবো—শুধু আজকের রাতটা—

এ আবার কেমনধারা কথা! সুবিধে মনে হচ্ছে না তো। গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো লোকটা নেশাখোর। ওসব ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই এখানে চলবে না। ও তো জানে না, আমরা মনোরমার গার্জেন এখানে উপস্থিত আছি!

রতন উঠে গিয়ে বললে, এই যে মশাই, উঠুন! এটা ঘুমোবার জায়গা নয়!

লোকটা বললে, শুধু রাতটা···এখানে থাকবো···তার জন্যে পয়সা দেবো···

রতন এবার লোকটার প্রায় ঘাড়ের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বললো, ঘুমোতে হয় তো হোটেলে যান না, এখানে কেন?

—হোটেল আছে এখানে?

—বাজারের কাছে আছে অন্নপূর্ণা হোটেল, সোজা সেখানে চলে যান।

—তাই যাবো, আমাকে একটু ধরে তুলুন তো, উঠতে পারছি না।

রতন লোকটার গায়ে হাত দিয়েই চমকে বলে উঠলো, ওরে বাবা, এ কি!

তারপর আমাকে ডেকে বলল, বঙ্কু, একবার এদিকে আয় তো।

আমি উঠে যেতেই রতন বললো, লোকটার কী হয়েছে, দ্যাখ তো?

লোকটা আবার ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়েছে। আমি তার একটা হাত ছুঁয়ে রতনের মতনই চমকে উঠলাম। লোকটার গা অসম্ভব গরম।

আমি বললাম, এ লোকটার তো খুব জ্বর হয়েছে দেখছি।

লোকটি আবার মুখ তুললো, চোখ দুটো অসম্ভব লাল। সে বললো, আমাকে একটু তুলে ধরুন, আমি ঠিক যেতে পারবো।

লোকটির কথাবার্তা আমাদের মতন নয়। বোঝাই যায়, শহুরে ভদ্দরলোক। টিকোলো নাক, টানা টানা চোখ, ফর্সা রং—সিনেমায় এমন চেহারা দেখা যায়। এমন লোক হঠাৎ আমাদের এখানে এসেছে কেন?

আমি আর রতন লোকটিকে দু'দিক থেকে ধরে তুললাম। লোকটি মাতালের মতন টলতে লাগলো। রতন জিজ্ঞেস করলো, আপনার কী হয়েছে?

লোকটি বললে, মাথায় অসহ্য ব্যথা!

জিতেন চেঁচিয়ে বললো, বোধহয় ম্যালেরিয়া ধরেছে।

আমি বললাম, আপনি এই অবস্থায় যাবেন কি করে? মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন যে। আপনার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে।

—এখানে কোথা থেকে এসেছেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বললো, আমাকে দয়া করে একটু রাস্তা পর্যন্ত পেঁৗছে দিন!

মনোরমা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, জ্বর হয়েছে, না নেশাভাঙ করেছে?

আমি বললাম, নেশা করলে গা এত গরম হয় না।

—রাস্তা দিয়ে কি হাঁটতে পারবে?

—বোধহয় পারবে না!

—তাহলে ঐ টেবিলের ওপরেই শুইয়ে রাখ!

এই কথাটা আমিও ভাবছিলাম। একটা অসুখে পড়া অসহায় লোককে

রাস্তায় ফেলে রেখে আসার কোনো মানে হয় না। চেহারা দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক, পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলে। সে এখানে মরতে এলো না কেন?

লোকটাকে আমরা টেবিলের ওপরেই শুইয়ে দিলাম। একটা ডাক্তার এনে দেখালে ভালো হতো। কিন্তু অত রাত্তিরে ডাক্তারই বা কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি বললাম, আপনি কিছু ওষুধ-টষুধ খাবেন না!

লোকটা বললো, না, দরকার নেই, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনোরমা বললো, একটু জল দিয়ে মাথাটা ধুইয়ে দেবো?

—তা দাও না!

মনোরমা ঘর মোছার বালতিতে করে নিয়ে এলো এক বালতি জল আর মগ। মগে করে মাথায় জল ঢালতে গিয়ে বললো, ও মা, এর মধ্যে দেখছি অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডান পায়ের গোড়ালিটা দ্যাখো রতনদা, কতখানি ফুলে আছে; নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে পায়ে। সাপে-টাপে কামড়ায় নি তো?

রতন বললো, দূর! সাপে কামড়ালে কী এতক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে? এমনি জ্বর-জারি হয় না মানুষের! সত্যি কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? দেখি—রতন দু'চারবার নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলো, তবু লোকটার আর সাড়া নেই। সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। মনোরমা তবু জল দিয়ে তার মাথাটা ধুইয়ে দিলো।

এত হাঙ্গামার মধ্যে আর আমরা পকেট থেকে বাংলার বোতল বার করতেই পারিনি। রাত বাড়ছে, বাড়িতেও তো যেতে হবে।

পরাণ অধৈর্য হয়ে বললো, ও মনো, চারটে গেলাস দে ভাই, আর দেরি করতে পারছিনি।

সেদিন খাওয়া হলো বটে, কিন্তু জমলো না। মনোরমা গান গাইলো না। আমরা তাকে নাচতে বলতেও পারলাম না। ঘরের মধ্যে আর একটা অচেনা লোক হাত পা চিতিয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে কী আমরা আনি মানি জানি না খেলতে পারি! প্রতি শনিবার রাত্রে মনোরমার সঙ্গে আমাদের এই যে খেলাটা—সেটা তো সারা পৃথিবীর অজান্তে। তখন আর বাইরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না—আজ শুধু আমরা চারজন আর মনোরমা। এর মধ্যে আবার এই উট্‌কো উৎপাত এলো কেন? এর বদলে একটা ডাকাত এলেও আমরা প্রাণপণে লড়াই করে তাকে মনোরমার কাছে ঘেঁষতে দিতাম না। কিন্তু এ যে একজন অসুস্থ লোক, একে রাস্তায় ফেলে দেওয়া যায় কী করে? মনোরমা এর মাথা ধুইয়ে দিলেও আমরা আপত্তি করতে পারি না।

অনেকটা ঝিম মেরে বসে থেকেই আমরা সময় কাটিয়ে দিলাম। এবার যেতে হবে। উঠে এসে আমরা প্রত্যেকে আবার লোকটার কপাল ছুঁয়ে দেখলাম। আমরা সঠিক জেনে নিতে চাই লোকটা সত্যিই অসুস্থ কিনা। যদি অসুখের ভান করে ঘাপটি মেরে থাকে, তাহলে এই দণ্ডেই আমরা ওকে লাথি মেরে বার করে দেবো।

না। গা এখনো গরম আগুন। এখনও জ্ঞান নেই। নিজের গা কেউ ইচ্ছে করে গরম করতে পারে না!

আমরা বিদায় নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি দেখে মনোরমা জিজ্ঞেস করলো, এ এমনিই শুয়ে থাকবে? রাত্তিরে খাবে-টাবে না কিছু?

রতন বললো, খাওয়ার আর ক্ষমতা নেই।

—ও রতনদা, যদি লোকটা মরে-টরে যায়?

—আরে না। মরা অত সহজ নাকি? জ্বর হলে কেউ মরে না। লোকটা থাক এ রকম শুয়ে। সকাল হলে বিদায় করে দিবি।

আমরা বেরিয়ে এলাম। মনোরমা ঝাঁপ বন্ধ করে খিল লাগালো। আমাদের চারজনেরই মনের মধ্যে অস্বস্তি। আমরা মনোরমার গার্জেন; আর রাত্তিবেলা তার কাছে আমরা অচেনা লোককে রেখে এলাম। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী?

একটুকু বাদে জিতেন বললো, লোকটা কে? চোর ছ্যাঁচোড় না তো?

পরাণ বললো, দেখে তো তা মনে হয় না।

—আরে রাখ রাখ! চেহারা দেখে কী আর মানুষ চেনা যায়? বড় বড় শহরের চোরদের চেহারা ওরকম ভদ্দরলোকের মতনই হয়!

—তা শহরের চোর জগুদার চায়ের দোকানে কী চুরি করতে আসবে?

—রাজবন্দী নয় তো? জেল-টেল থেকে পালাতে পারে!

—লোকটা নাম বলে নি, ধাম বলে নি! কোথা থেকে এলো!

—পুলিস-টুলিসের হাঙ্গামা হবে না তো!

রতন থমকে দাঁড়ালো। চিন্তিত ভাব করে বললো, আমাদের কারো আজ রাতে মনোরমার কাছে থাকা উচিত ছিল। যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়—

আমরা বাকি তিনজন তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে ওকে বিঁধলাম। রতনটা স্বার্থপরের মতন কথা বলছে। আমাদের প্রত্যেকেরও কি সেই ইচ্ছে হচ্ছে না? মনোর বিপদের সময় তার পাশে বুক পেতে দাঁড়াতে কী আমরা চাই না? কিন্তু এ কথাও জানি, আমাদের মধ্যে একলা কেউ মনোর সঙ্গে সারারাত থাকলে সে

একলা একলা আনি মানি জানি না খেলা খেলবে। তাতে আমাদের বাকি তিনজনের বুক জ্বলে যাবে না।

রতন আমাদের তীক্ষ্ণ চোখ দেখে থতমত খেয়ে গেল। আবার চলা শুরু করে সে বললো, বাড়ি না ফিরলে বউ কি আমাকে ছাড়বে? নিজেই ছুটে আসবে হয়তো! জানে শনিবার এই সময়টা কোথায় থাকি!

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমাদেরও ঘরে বউ ছেলে-পুলে আছে। অশান্তি এত বেশী আছে যে আর বেশী অশান্তি ডেকে এনে কোনো কাজ নেই। মনোরমার কাছে যদি রাত্রে থেকে যাই, তাহলেই বাড়িতে অশান্তি। মনোর কাছে কেউ একা এলো কিনা, সেটা দেখবার জন্যে আমরা বাকি তিনজন তক্কেতক্কে থাকি! মনোরমা আমাদের চারজনের একা কারুর না।

রোববারটা আমাদের চারজনেরই ছুটি। সকালবেলা বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে আমি চলে এলাম জগুদার দোকানে। আর তিনজনও এসে গেল অল্প-ক্ষণের মধ্যে। যেন আগে থেকে ঠিক করাই ছিল।

চায়ের জন্যে তখন আর কোনো খদ্দের আসে নি। শুধু আমরাই চারজন। সেই লোকটা টেবিলের ওপর নেই।

—ও মনো, মনোদিদি!

কোনো সাড়াশব্দ নেই। পিছনের রান্নাঘর। অন্যদিন তো উনুনে আঁচ পড়ে যায় এই সময়। সেখানে উঁকি দিয়ে দেখি, রান্নাঘরের মেঝেতেই আঁচল পেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে মনোরমা। আবার আমাদের ডাক শুনে সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলো। চোখ মুছে বললে, তোমরা এসে গেছ!

—তুই এখানে ঘুমোচ্ছিস কেন?

—ঘুমুচ্ছিলাম কোথায়, শুয়ে ছিলাম! সারা রাত একটু ঘুমুতে পারিনি। আমার এত ভয় করছিল!

আমরা অবাক! মনোরমার ভয়? তাকে আমরা এ রকম বলতে শুনিনি। বলি, কেন মনোদিদি, ভয় করছিল কেন? কী হয়েছে?

মনোরমা আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বললো, সারারাত লোকটার বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছিলো, আর মাঝে মাঝে মা মা বলে ডেকে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম, ও বুঝি যে-কোনো সময় মরে যাবে। এই রকম একটা লোককে তোমরা এখানে রেখে গেলে কী আক্কেলে। আমার কথাটা ভাবলে না?

ভেবেছিলাম মনো, আমরা তো সারারাতই তোর কথা ভেবেছি। পাশে

শোয়া রোগা বউ, ছেলেমেয়েগুলোর চ্যাঁ ভ্যাঁ কান্না, এর মধ্যেও তো আমরা তোর কথাই ভাবি। তুই ছাড়া আমাদের কী আর আছে! কিন্তু আমাদের উপায় ছিল না। ইচ্ছে থাকলেও আমরা একলা কেউ তো এখানে থাকতে পারি না। তা লোকটা গেল কোথায়? চলে গেল?

—কোথায় যাবে? দেখো গে শুয়ে আছে আমার ঘরে।

—তোর ঘরে? নিজে উঠে গেল? তাহলে তো মানুষটা অতি বদ্।

—নিজে নিজে যাবে কেন! সে শক্তি কি আছে? রাত্তিরবেলা অমন ঘড়ড় ঘড়ড় করছিল, আমার ভয় হলো যদি টেবিল থেকে উল্টে পড়ে যায়? তাহলে তো সেই অবস্থাতেই মরবে—তখন আমরাই তো হাতে দড়ি পড়বে।

আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে উঁকি দিলাম মনোরমার ঘরে। যে-বিছানায় জগুদাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেইখানে, ঠিক সেই রকম হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে লোকটা। আমাদের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো একবার। সত্যি মরে গেছে নাকি?

পরেই বুঝলাম, না। নিশ্বাসে বুক উঁচু নিচু হচ্ছে। লোকটার কপালে জলপটি। মনোরমা যত্ন করে তার গায়ে একটা চাদর টেনে দিয়েছে।

মনোরমা নিজেই একে পাঁজাকোলা করে তুলে এনেছে টেবিল থেকে। মনোরমার সে শক্তি আছে। লোকটিকে কিন্তু এখানে মানায় না। ঠিক যেন মনে হয় গরীবের ঘরে এসে ঘুমিয়ে আছে কোনো রাজপুত্তুর।

কিন্তু এ কতক্ষণ এখানে আরাম করে ঘুমোবে। একটু পরেই লোকজন আসবে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে। যা হোক একটা কিছু বলে দিতে তো মানুষের জিভে আটকায় না—

আমরা চারজন দরজার কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি। কে আগে লোকটিকে ডাকবে ঠিক করতে পারছি না। এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। এমন সময় লোকটি নিজেই চোখ মেললো।

আমাদের চারজনকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন ভয় পেয়ে গেল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, আমি কোথায়?

রতন বললে, আপনার অসুখ করেছে।

—আপনারা কারা!

পরাণ বললে, কাল আমরাই তো আপনাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে গেলাম, মনে নেই?

—ও। কিন্তু এটা তো বিছানা।

—হ্যাঁ, বিছানা। এটা চায়ের দোকানের মালিকানির বিছানা।

রতন লোকটির কপালে হাত রেখে বললে, এখনো তো বেশ জ্বর আছে দেখছি। তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়। আপনি হাসপাতালে যেতে পারবেন ?

লোকটি বললে, কোনো দরকার নেই। আমি খানিকটা বাদে ঠিক হলে আপনা আপনি চলে যাবো। আমি যে এখানে আছি, সে কথা কারুকে বলার দরকার নেই।

—কেন ? আপনি কে।

লোকটি হাত জোড় করে বললে, বিশ্বাস করুন। আমি কোনো খারাপ লোক নই। আমার পরিচয় এখন জানাবার অসুবিধে আছে।

কোনো ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের সঙ্গে হাত জোড় করে কথা বললে আমাদের গা চিড়্‌চিড় করে। এ রকম ন্যাকাপনা আমার একদম সহ্য হয় না। দরকারের সময় হাত জোড় আবার অন্য সময় চোখ রাঙানো, এসব আমরা ঢের দেখেছি। কিন্তু লোকটির মুখের ওপর কোনো কথা বলতে পারলাম না। লোকটি এমনভাবে কথা বলছে, যাতে মনে হয়, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে ; বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে।

বাড়িতে বাজার করে নিয়ে যাবার কথা। আর তো বেশী দেরিও করা যায় না। হপ্তায় এই একটা দিনই তো নিজের হাতে বাজার করা।

বেরিয়ে এসে দেখি, মনোরমা রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে ফেলেছে। দুধ জ্বাল দিচ্ছে। আমাদের দেখে বললো, তোমরা একটু বসো গো। চায়ের জল এবার চাপাবো। কেমন দেখলে ?

—এখনো তো বেশ জ্বর !

—কাল কিছু খায় নি। এখন একটু গরম দুধ খাইয়ে দিই, কি বল ?

—দে, তাই দে !

চা-টা খেয়েই আমরা দৌড় লাগালুম। সেদিন সারাদিনে আর চায়ের দোকানে যাওয়া হলো না। কারখানা বন্ধ থাকলে আর এত দূরে বারবার আসা হয় না। রবিবারে এই জন্যই এ দোকানে খদ্দের খুব কম থাকে।

এরপর দিন তিনেকের মধ্যে লোকটি গেল না। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বুকে অসহ্য ব্যথা। রতনের ধারণা ওর নিমোনিয়া হয়েছে। জিতেনের

ধারণা, ক্ষয়কাশ। এসব ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে মনোরমার কী থাকা উচিত। কিন্তু মনোরমা দিনরাত সেবা করছে লোকটাকে। এমন কি দোকান চালাবার দিকেও তার মন নেই, খদ্দেররা চায়ের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে করে চলে যায়। এমন কি আমরা যে মনোরমার গার্জেন, আমার দিকেও তার নজর নেই আর। আমরা কিছু বলতে গেলেই ও বলে, তা বলে কী লোকটাকে মরে যেতে দেবো। একটা ভদ্দরলোকের ছেলে, সে কি আমার হাতে জল খেয়ে মরতে এসেছে? তোমাদের মায়া হয় না!

রতন এক কবিরাজের কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ওষুধ এনে দিয়েছে। কথাটা সে আমাদের কাছ থেকে গোপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের নজর এড়াবার উপায় নেই। ধরা পড়ে গিয়ে সে বললো, বুঝলি না, ওকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলে বিদায় করতে পারলে তো আমাদেরই সুবিধে। নইলে, মনো যেমন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে, তাতে দোকানটাই না উঠে যায়!

জিতেন বললো, আজ বটতলায় শুনলাম, দুটো লোক বলাবলি করছিল যে জগুদার চায়ের দোকানে কে একটা লোক নাকি লুকিয়ে আছে। এখন এ কথাটা চাউর হয়ে গেলেই তো বিপদ।

আমরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ালাম। সত্যি তো বিপদের কথা। লোকটা নিজের পরিচয় জানাতে চায় না। আমরা মনোরমার বিপদে-আপদে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু মনোরমাকে এই বিপদ থেকে কী করে বাঁচাবো?

পাঁচদিনের মাথায় লোকটা অনেকটা সুস্থ হয়ে বিছানায় উঠে বসলো। এর মধ্যে গত দু'দিন মনোরমা চায়ের দোকান বন্ধই রেখেছিল। সবাই জানে, মনোরমার অসুখ। শুধু আমরা আসল ঘটনাটা জানি। আমরা চুপিচুপি সন্ধ্যের দিকে একবার এসে খবর নিয়ে যাই। সে সময় মনোরমা আমাদের চা খাওয়াতেও ভুলে যায়।

লোকটা বিছানায় উঠে বসেছে, আমরা দরজা দিয়ে উঁকি মারলাম। মনোরমা ঘরের কোণে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটার মুখের দিকে।

লোকটা আমাদের দেখে বললো, আসুন, এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম মনে হচ্ছে।

আমরা চারজনে ঘরে ঢুকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। আমাদের বুকের ভেতরে একটা চাপা আনন্দ। লোকটা তাহলে এবার বিদায় হবে। আবার শনিবার এসে গেছে, আবার আমরা মনোরমাকে নিজেদের করে পাবো।

লোকটা মনোরমার দিকে তাকিয়ে বললো, এ'র সেবাতেই বে'চে গেলাম। এ'র শরীরে খুব দয়া-মায়া আছে। নইলে, আমি অচেনা-অজানা লোক।

মনোরমার শরীরে যে দয়া-মায়া আছে, এ কথা আমরা প্রথম অন্য কারুর মুখে শুনলাম। সবাই জানে, সে দুর্দান্ত রাগী আর জাঁদরেল। অবশ্য মনোরমা কী রকম সে কথা আর আমাদের বলতে হবে না। দয়া না থাকলে সে আমাদের কারুর পায়ে ঝি'ঝি ধরলে হাত ধরে টেনে তোলে ?

লোকটি বললো, এর ঋণ কী করে শোধ করে যাবো, জানি না। আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই—

মনোরমা ঝংকার দিয়ে বললো, থাক আপনাকে আর ঋণ শোধের কথা চিন্তা করতে হবে না ; এখনো হাঁটতে গেলে পা টলটল করে—

লোকটি বললো, তবে, আমি উপকার ভুলি না। একদিন ঠিক আবার ফিরে আসবো, যদি বে'চে থাকি—

—সে তো পরের কথা। এখন আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে ? আগে খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করুন।

লোকটি বললো, তা মন্দ না। বেশ খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর করে তারপর আমি এই রেস্টুরেণ্টে বয়ের কাজও করতে পারি। লোককে চা দেবো, কাপ ডিশ ধুয়ে দেবো—

পরদিন আমরা গিয়ে দেখি, দোকান খোলা, কিন্তু একজনও খদ্দের নেই। ক্যাশ কাউণ্টারে মনোরমা একা বিমুখ হয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেও একটা কথা বললে না।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেল ? সেই লোকটা কোথায় গেল ?

মনোরমা ডান হাতখানা হাওয়ায় ফেরালো শুধু ?

—কী হয়েছে, মনো দিদি ? হলোটা কী ?

মনোরমা চে'চিয়ে ধমকিয়ে বললো, চলে গেছে। সে চলে গেছে।

—আমাদের আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছে করছিল। চলে গেছে তো আপদ গেছে !

আবার চায়ের দোকানের বয় হবার কথা বলছিল ! রাজপুত্তুরের মত চেহারা নিয়ে চায়ের দোকানে বয়গিরি, যতসব ন্যাকাপনা কথা ?

—কখন গেল ? কী করে গেল ?

—সে কি আমাকে বলেছে ? একবার ঘুণাক্ষরে জানতেও দিলে না।

আমি তাকে একলা রেখে একটু খাল পাড়ে চান করতে গেছি—ফিরে এসে দেখি সে নেই। যে মানুষটা ভালো করে হাঁটতে পারে না, সে এমনি এমনি চলে গেল!

—নিশ্চয়ই ওর মতলব ভালো ছিল না। কিছু নিয়ে-টিয়ে যায় নি তো?

—ও মনোদিদি, সে কিছু চুরি করেনি তো?

মনোরমা বললে, আঃ তোমরা চুপ করবে, আমার ভালো লাগছে না। কী এমন হাতি ঘোড়া আছে আমার, যে সে নেবে!

ধমক খেয়ে আমরা চুপ করে গেলাম।

তারপর শনিবার এলো, কিন্তু মনোরমা আর গাইলো না। নাচলো না। আমাদের আনি মানি জানি না খেলা হলো না। মনোরমা আর সেই মনোরমা নেই, সে আর আমাদের গ্রাহ্য করে না। ঠায় চুপচাপ বসে থাকে। এমনি করেই দিনের পর দিন যায়। আমরা বুঝতে পারি, সেই লোকটা অন্য কিছু চুরি না করলেও, সম্পূর্ণ চুরি করে নিয়ে গেছে মনোরমার মন। সেই মনটার চেহারা যে কী রকম তা আর কখনো বুঝিনি।

রতন একবার সাহস করে বলেছিল, ও মনো, সেই লোকটা চলে গেল বলে তুই কতদিন আর এমনি করে থাকবি? দোকানটা যে যায়।

মনোরমার চোখের কোণে জল আসে। সে আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু সে যে আবার ফিরে আসবে বলেছে।

ওসব শহুরে লোকের ন্যাকাপনা কথা। এর কি কোনো দাম আছে? এ কথা আমরা মনোরমাকে বোঝাই কি করে?

যদি সম্ভব হতো, আমরা লোকটাকে ঘাড় ধরে নিয়ে আসতাম এখানে। কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজতে যাবো? আমাদের কারখানায় যে-কোনোদিন লক আউট হতে পারে, এখন একটি দিনও কাজ কামাই করতে ভরসা হয় না।

তবু রাগে আমাদের গা জ্বলে যায়। আমাদের আর কিছু নেই। সংসারেও শুধু নেই, নেই,। আমাদের ধর্মেন্দের হেমা মালিনী নেই, বাকী পৃথিবীর কিছুই জানার দরকার নেই। শুধু আমাদের মনোরমা ছিল কিন্তু সেই লোকটা, রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, শহুরে মানুষ—ওদের তো কত কিছু আছে, কত রকম আমোদ আর রঙ্গ রস। তবু সে কেন আমাদের মনোরমার মনটা কেড়ে নিয়ে গেল?

মনীষার দুই প্রেমিক

আমি মনীষাকে ভালোবাসি। মনীষা আমাকে ভালোবাসে না। মনীষা অমলকে ভালোবাসে।

ব্যাপারটা এরকমই সরল। কিন্তু অমল সম্পর্কে আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এক বিশাল সন্ধেবেলা দিকচিহ্নহীন মন্থর আলোর মধ্যে অমল ও মনীষাকে যখন আমি পাশাপাশি দেখতে পাই—অমলের চওড়া কব্জির ধার ঘেঁষে মনীষার মসৃণতা সামান্য গ্রীবা তুলে মনীষা রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে কৃতজ্ঞ ও ধন্য করে—আমি তখন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক্, একই বাতাসের মধ্যে তো আমরা আছি। অমল, তুমি সৎ হও, আরও বড় হও, কতখানি দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। অমল, তুমি পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সাহায্য করবো।

অমল বিমান চালায়। ভোরবেলা একটা স্টেশন ওয়াগন এসে অমলের বাড়ির সামনে হর্ন দেয়, অমল বেরিয়ে আসে—তখনও চোখে মুখে ঘুম, কিন্তু সাদা পরিচ্ছদে তাকে কী সুন্দর দেখায়। দাড়ি কামাবার পর অমলের গালে একটা নীলচে আভা পড়ে, ঠোঁট দুটি ওর ভারী পাতলা—সিগারেট ঠোঁটে চেপে কথা বলবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুপ করে সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। স্টেশন ওয়াগনে উঠে অমল ফের নিজের বাড়ির তিনতলার জানলার দিকে তাকায়। একটু পরেই দমদম থেকে অমল ইস্তাম্বুল উড়ে চলে যাবে। আবার ফিরেও আসবে।

অমল বিমান চালায়। অমল মোটরগাড়ি চালাতে জানে কিনা—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু একথা জানি, অমল সাইকেল চালাতে পারে না। অমল কি সাঁতার জানে? খোঁজ নিতে হবে তো! সাইকেল ও সাঁতার দুটোই আমি জানি, দেওঘর থেকে ত্রিকুট পাহাড় পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, গিরিডিতে উশ্রী জলপ্রপাতে একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে পড়ে বহুদূর ভেসে গিয়েছিলাম, বাঁচবো এমন আশা ছিল না তবুও তো বেঁচে গেছি। কিন্তু ছি ছি, এসব আমি কি ভাবছি! আমি কি গর্ব করবো নাকি এ নিয়ে? ভ্যাট। সাইকেল কিংবা সাঁতার জানা এমন কিছুই না! ও তো কত হেঁজি-

পেঁজি লোকেও জানে। কিন্তু অমল বৈমানিক, দৃঢ় স্বাস্থ্যময়, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখ অমল নীলিমার বুক চিরে রুপালী বিমান নিয়ে উড়ে যায় ইস্তাম্বুলে কিংবা সাও পাওলো বন্দর পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে। কিন্তু অমল, তোমাকে আরও মহীয়ান হতে হবে।

সবার চোখে পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মনীষার পা পৃথিবীর মাটি ছোঁয় না। এই ধুলোবালির নোংরা পৃথিবী থেকে কয়েক আঙুল উঁচুতে সে থাকে। মনে আছে, সেই বৃষ্টির দিনের কথা? একটু আগেও রোদ ছিল, হঠাৎ সব মুছে গিয়ে খয়েরি রঙের ছায়া পড়লো সারা শহরে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। আমি ছুটে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমলো, গাড়ি-ঘোড়া অচল হলো, বৃষ্টির তখনও সমান তেজ। জলের ছাঁটে ভিজে যাওয়া সিগারেট টানতে যে রকম বিরক্তি, সেই রকম বিরক্ত বা বিমর্ষভাবে আমি দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় মনীষাকে দেখতে পাই, দু'জন সখীর সঙ্গে সে জল ভাঙতে ভাঙতে উচ্ছল হয়ে আসছে। আমাকে ডাকতে হয় নি, মনীষাই সব জায়গায় সকলকে প্রথম দেখতে পায়—মনীষাই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বললো, এই বরুণদা, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন, আসুন, চলে আসুন! আজ বৃষ্টিতে ভিজবো!

জলের মধ্যে মানুষ ছুটতে পারে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো ছুটে যাই। একটু আগেও গায়ে সামান্য জলের ছাঁট অপছন্দ করছিলুম, কিন্তু তখন মনে হলো হাঁটু গভীর জলে সাঁতার কাটি। সখী দু'জন ইডেন হসপিটাল রোডের হস্টেলে চলে গেল, আমি আর মনীষা মাঝরাস্তা দিয়ে হাঁটছি জল ভেঙে ভেঙে, তখনও অঝোরে বৃষ্টি, সারা রাস্তায় আর কেউ নেই, সব পায়রারা খোপে ঢুকে গেছে—চুপচুপে ভিজে গেছি আমরা দু'জনে, মনীষার কানের লতিতে মুক্তোর দুলের মতন টলটল করছে এক ফোঁটা জল, এইমাত্র সেটা খসে পড়লো। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষা অন্য কারুর মত নয়—এই চেনা পৃথিবী, এই নোংরা জল কাদা, রাস্তার গর্ত, ভেসে যাওয়া মরা বেড়ালছানা—এসবের মধ্য থেকেও মনীষা এত আনন্দ পাচ্ছে কি করে? বেড়াতে গেলে মানুষ এমন আনন্দ পায়—মনীষা যেন অন্য গ্রহ থেকে এখানে দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। আমরা এখানকার শিকড়-প্রোথিত অধিবাসী, অনেক কিছুই আমাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে—মনীষার কাছে সব কিছুই নতুন এবং আনন্দোজ্জ্বল।

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওয়েলিংটন পর্যন্ত চলে আসি। এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কত কঠিন, কিন্তু একটা খালি ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, বিশালকায় ড্রাইভার ক্রীতদাসের মতন বিনীত ভঙ্গিতে মনীষার দিকে চেয়ে বলে, আসুন! যেন তার নিয়তি তাকে মনীষার কাছে পাঠিয়েছে, তার আর উপায় নেই। মনীষা হঠাৎ আবিষ্কারের মতন আনন্দে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার ট্যাক্সি চড়বেন? যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ ঘুরবো কিন্তু!

দরজা খোলার পর মনীষা যখন নিচু হয়ে ঢুকতে যায়, তখন তার ফর্সা পেট আমার চোখে পড়ে, জলে ভেজা নাভি. দার্জিলিং-এর কুয়াশায় আমি একদিন এই রকম চাঁদ দেখেছিলাম। আঁচল নিংড়ে মুখ মুছতে মুছতে মনীষা বলে, আঃ যা ভালো লাগছে আজ! এই বরুণদা, আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? আমি বিনা দ্বিধায় মনীষার কাঁধে হাত রেখে বলি, তুমি একদম পাগল! বৃষ্টিতে ভিজতে এত ভালো লাগে তোমার?

—ভীষণ! ভীষণ! বৃষ্টিতে ভিজলেও আমার কক্ষণো ঠাণ্ডা লাগে না।

—তুমি তাকাও তো আমার দিকে! তোমাকে ভালো করে দেখি।

—ভালো করে দেখবেন? আমি পাগল না আপনি পাগল?

—তা হলে দুজনেই।

—মোটেই না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাগল হতে রাজী নই! এ কথা বলার সময়েও মনীষা আমার দিকে ঘুরে তাকায়। নির্নিমেষে আমি দেখি। সুকুমার ভুরুর নিচে দুটি দ্বিধাহীন চোখ, এই যে নাক—ইটালীর শিল্পীরা এক সময় এই রকম নাক সৃষ্টি করেছে, উড়ন্ত পাখির ছড়ানো ডানার মত ঠোঁটের ভঙ্গি, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখানো। একথা ঠিক, ওর ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের রং ভেদ করে জেগে ওঠা রুপোর জামবাটির মতন স্তন আমার চোখে পড়লেও, সেখানে আমার হাত দিতে ইচ্ছে করেনি, ইচ্ছে করেনি কুয়াশায় আধো-ভেজা চাঁদ ছুঁতে। এক এক সময় হয় এ রকম, তখন সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষার সেই সিক্ত সৌন্দর্যের পাশে আমার লোমে ভরা শক্ত হাতটা সেই মুহূর্তে মানাবে না। আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মনীষা আরও হাসুক, উচ্ছল হাসির তরঙ্গে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠুক, তা হলেই ওর রূপ আরও গাঢ় হবে। কিন্তু কি করে ওকে আরও খুশী করবো—ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, মনীষা, ভাগ্যিস তোমার

সঙ্গে দেখা হলো, নইলে আমি বোধ হয় এখনও বোকার মতন সেই গাড়ি-বারান্দার নিচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম !

রাস্তার জলের দিকে তাকিয়ে মনীষা বললো, দেখুন, দেখুন, কি রকম ঢেউ দিচ্ছে, ঠিক নদীর মতন।

—তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে ?

—ইউনিভার্সিটিতে। লাইব্রেরীর দু'খানা বই ছিল ফেরত দিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

—কেন, তুমি রিসার্চ করবে না ?

—ঠিক নেই। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন ?

—তুমি আসবে, সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

চোখে চোখ রাখলো, একটু হাসলো, হাসি মিশিয়েই বললো, সত্যি, কোনোদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন ? আপনি যা অহংকারী।

অমল আমাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ি পরে থাকে। আমি নয়, সত্যিকারের অহংকারী হচ্ছে অমল। পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে মেশে না। আমাকে দেখেছে, মুখ চেনে, তবু আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। তা হোক, তবু অমলকে আমি পছন্দ করি। অমলের চেহারায় ব্যবহারে একটা দীপ্ত পৌরুষ আছে—অহংকারের যোগ্য সে, আমি ঐরকম অহংকার দেখতে ভালোবাসি। সপ্তাহে তিনদিন অন্তত অমল কলকাতায় থাকে, ছুটির দিন সকালে, ন'টা আন্দাজ অমল বাড়ি থেকে বেরোয়, তার গভীর ভুরুর নিচের চোখ দুটিতে তখনও ঘুম লেগে থাকে—ধপধপে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাত গোটানো, পথের দু' পাশে না তাকিয়ে অমল হাজরা মোড় পর্যন্ত যায়, অধিকাংশ দিনই সে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—অমলকে আমি কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে অমল একটু দাঁড়ায়, সিগারেট ধরিয়ে অমল এবার পূর্ণ চোখ মেলে চৌরাস্তার মানুষজন দেখে। বস্তুত, পথের সমস্ত মানুষও একবার অমলকে দেখে, এমনই তার পৃথক ব্যক্তিত্ব। তখনও মনীষার সঙ্গে অমলের পরিচয় তত প্রগাঢ় হয় নি, অমল রাস্তা পেরিয়ে সার্দান অ্যাভিনিউয়ের দিকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়।

একদিনে নয়, অমলকে দেখতে ও চিনতে আমার সময় লেগেছে। আগে আমি অন্যমনস্কভাবে অমলের প্রশংসাকারী ছিলাম। অথবা, তার ঠিক পটভূমিকায় তাকে আমি দেখিনি।

হঠাৎ দেখা না হলে মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিল্লী থেকে কয়েক দিনের জন্য এসেছে কোনো বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি— সেখানে সমস্ত বাড়িতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে রয়েছে মনীষা। সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর কি রকম আত্মীয়তা। সাদা সিল্কের শাড়িতে মনীষাকে খুবই হাল্কা, প্রায় অপার্থিব দেখায়—আমার কাছে এসে মনীষা বলে, একি, আপনার জামার মাঝখানের বোতামটা লাগান নি কেন? অবলীলায় মনীষা আমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাবো না। ঐ বিশাল বাড়িতে অন্তত সাতখানা ঘর ফাঁকা থাকে, যদি সেখানে কোনোদিন আমি দস্যু হয়ে উঠি? যদি রূপ-হন্তারক হতে সাধ হয় আমার? মনীষা একদিন আয়নার সামনে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছিল, আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—সেই দৃশ্যটা আমার বুকে বিঁধে আছে। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। মনীষা আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—কিন্তু আয়নার মধ্যে আমরা দু'জনকে দেখছিলাম—আমরা দু'জনে একই দিকে তাকিয়ে—অথচ দু'জনকে আমরা পরস্পর দেখতে পাচ্ছি,—মনীষার আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়বো, পড়বো—অথচ খসে নি, কি এক অসম্ভব কায়দায় সে দুটি মাত্র হাতে চুল, চুলের ফিতে, চিরুনি এবং আঁচল সামলাচ্ছে—চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। মনীষা কখনো অপ্রতিভ হয় না—পিছনে আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, কি মেয়েদের প্রসাধনের রহস্য দেখার খুব ইচ্ছে বুঝি? ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখবেন—আমি এগারো রকমের স্নো-পাউডার মাখবো!

আমি বললুম, ওরে বাবা, এত সাজ-পোশাক, কোথাও বেড়াতে যাবে বুঝি?

—হুঁ।

—কোথায়?

—ছাদে।

আয়নার ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু মুশকিল এই, আয়নার মধ্যে নিজের মুখের ছায়া না ফেলে অন্য কিছুও যে দেখা যায় না।

সেইরকমই এক রবিবারের সকালে অমল ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে

হাঁটতে মোড়ে এসে পেঁছলো. রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে আসছিল মনীষা, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওরা ঠিক সমকোণে মিলিত হলো—সম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে অমল মনীষাকে বললো, কি ভালো আছেন ?

মনীষা উদ্ভাসিত মুখে বললো, আরেঃ আপনি ? আপনি ব্যাংকক্ গিয়েছিলেন না ? কবে ফিরলেন ?

—কাল সন্ধেবেলা।

—পরশু গিয়ে কাল ফিরে এলেন ?

অমল সংযতভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ। আপনি এখন কোনদিকে যাবেন ?

—একটু লেক মার্কেটের কাছে যাবো।

—চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাক্।

সেই প্রথম আমি অমলকে সোজা না গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে দেখলাম। আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনীষা আমাকে দেখতে পায় নি। সেই প্রথম মনীষা আমাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওকে ডাকি নি কেন ? আমি ডাকলে মনীষা আমার সঙ্গেই যেতো—অমলের সঙ্গে যেতো না—অমলের সঙ্গে ওর তখনও তেমন গাঢ় চেনা ছিল না। কিন্তু আমি ডাকি নি কেন ? ঠিক জানি না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মনীষা আর অমল যদি কখনো পাশা-পাশি আয়নার সামনে দাঁড়ায়, অমলকে সরে যেতে হবে না !

ওদের দু'জনকে বড় সুন্দর মানায়। বুকটা টনটন করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, 'ধ্যাৎ। চেহারাই কি সব নাকি ? আমি একটু বেশী রোগা—কিন্তু রোগা মানুষরা কি ভালোবাসার যোগ্য হতে পারে না ?

জি এম আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন, তুমি তো বিয়ে করো নি, সন্ধে-গুলো কাটাও কি করে ?

অফিসে জি এম-এর মুখ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি। সামান্য হেসে বললুম, কি আর করবো, বাড়ি ফিরে স্নান করি, তারপর চা খেয়ে বইটই পড়ি, রেকর্ড শুনি।

—সে কি হে ? আর কোনো এণ্টারটেইনমেণ্ট নেই ? তবে যে শুনি তোমাদের মতন ইয়ংম্যানদের জন্য কলকাতা শহরে, মানে, অনেক নাইট স্পট্।

—স্যার, ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

—শোনো, দিল্লী অফিস থেকে মিঃ চোপরা আসছেন। ওঁকে আমরা আজ গ্রাণ্ডে ডিনার দিচ্ছি। তুমিও থাকব। মিঃ চোপরা একটু ইয়ে মানে লাইট

স্বভাবের লোক, তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়ে ওকে কলকাতার নাইট লাইফ একটু দেখিয়ে আনবে।

—নাইট লাইফ মানে ?

—সে আমি কি বলবো ? তোমরা ইয়ংম্যান যা ভালো বুঝবে। চোপরার একটু ফুর্তিটুর্তি করার বাতিক আছে !

—স্যার আমি পারবো না। অন্য কারুকে এ ভার দিন।

—সেকি ? পারবে না কি ? চোপরার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে থাকলে তোমারই তো সুবিধে। সহজেই লিফট্ পেয়ে যাবে—ওরাই তো হর্তাকর্তা।

—না স্যার, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পাঞ্জাবী তো—ওর সঙ্গে যদি আমার রুচিতে না মেলে।

—পারবে না ? ঠিক আছে, দাসাপ্পাকে বলে দেখি। ওর আবার ইংরেজী উচ্চারণটা ভালো নয়—

সন্ধের পর স্বয়ং জি এম গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। বললেন, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, তোমাকেই যেতে হবে। দাসাপ্পার মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, হাসপাতালে—সে আসতে পারবে না। নাও নাও, তাড়াতাড়ি, আটটায় ডিনার।

—কিন্তু স্যার, আমার যে ওসব ভালো লাগে না ! ডিনারের পর আমি আর কোথাও যাবো না কিন্তু !

—বাজে বোকো না ! তোমারই ভালোর জন্য বলছি—চোপরাকে খুশী করতে না পারলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমাকে আমি তিনশো টাকা আলাদা দিয়ে দেবো—ডিনারের পর ওকে নিয়ে একটু···

—আমাকে ছেড়ে দিন ! আমি পারবো না।

—শুধু শুধু দেরি করছো ! চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও, এখন কথা বলার সময় নেই। চাকরি করতে গেলে বড় কর্তাদের খুশী করতেই হয়—তাও তো আমাদের আমলে আমরা সাহেবদের···

জি এম-কে বসিয়ে রেখেই আমাকে পোশাক পাল্টে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে নিতে হলো। জি এম আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, জুতোটায় একবার ব্রাশ ঘষে নাও।

ওঁর সঙ্গে নিচে নেমে, যখন গাড়িতে উঠছি, সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি মনীষার যোগ্য নাই। আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি ওপরে

ওঠার বদলে আরও নিচে নেমে যাচ্ছি।

মনীষাকে দেখলে রাজহংসীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পরিষ্কার টলটলে জলে যেখানে রাজহংসী নিজের ছায়া নিজেই দেখে। টাটকা তৈরি ঘিয়ের মতন মনীষার গায়ের রং, ঠোঁট দুটি একটু লালচে—এমন সাদা দাঁত শুধু শিশুদেরই থাকে। মনীষার ঠোঁট আর চোখ দুটো সব সময় ভিজে ভিজে, এই চোখকেই ইংরেজীতে বলে, লিকুইড আইজ'—মনীষাকে আমি কখনও গম্ভীর হতে দেখিনি, বেড়াতে গিয়ে কি আর কেউ গম্ভীর থাকে! ঐ যে বললুম, মনীষাকে দেখলেই মনে হয়—এ পৃথিবীতে সে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। এ পৃথিবীর কোনো কিছুই ওর কাছে পুরোনো নয়।

ঠিক চার মাস বারোদিন মনীষাকে দেখিনি। দেখিনি, কিংবা দেখা হয় নি, কিংবা মনীষা আমাকে খুঁজে পায় নি। তারপর একদিন লেক স্টেডিয়ামের ধারে মনীষাকে দেখতে পেলাম। মনীষার শরীরের এক-একটা অংশ আমার এক-একদিন নতুন করে ভালো লাগে।

সেদিন চোখে পড়লো ওর পা দুটো। জয়পুরী কাজ করা লাল রঙের চটি পরেছে, কি সুন্দর ঐ পা দুটো—মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধুলি-মলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধুলো লাগে না। মনে হলো, মনীষার ঐ পা দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলে আমি ফুলের গন্ধ পাবো!

মনীষা হাসলো, অবাক হলো এবং অভিমানের সুরে বললো, যান্, আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না!

—কেন? আমি কি দোষ করেছি?

—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি মোটেই আমার কথা ভাবেন না।

—মনি, অভিমান করলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়!

সাড়ে চার মাস বাদে দেখা হলেও পথের মধ্যে মনীষার হাত ধরা যায়। হাত ধরে আমি বললুম, মনি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো? আমার সঙ্গে চলো—

—এখন? ক'টা বাজে? ওমা, সাড়ে পাঁচটা? একজন যে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে।

—একজন? একজন তাহলে অপেক্ষা করে আছে? সে তা হলে অহংকারী নয়?

মনীষা ঠিক বুঝতে পারলো না, একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, আপনি চেনেন তাকে, অমল রায়, চলুন না, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একবার লোভ হয়েছিল বলি, না, অমলের কাছে যেতে হবে না—তুমি আমার সঙ্গে চলো! দেখাই যাক্ না এ কথা বলার পর কি ফল হয়? কিন্তু অতটা ঝুঁকি নিলাম না। আলতোভাবে বললুম, না, তুমি একাই যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম।

মনীষার চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। আমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, অমলই মনীষার যোগ্য। কিন্তু অমল, তুমি মনে করো না, তুমি মনীষাকে জিতে নিয়েছো। তা মোটেই না। আমিই মনীষাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অমল, তোমাকে মনীষার যোগ্য হতে হবে। তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আকাশে অমল বিমান চালিয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছে—আমার কল্পনা করতে ভালো লাগে—সে বিমানে আর কেউ নেই, মনীষা ছাড়া, ওরা দু'জন শূন্য থেকে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে, ইস্তাম্বুলের পথ ছাড়িয়ে গেল অজানা পথে—ইস্, ওদের দু'জনকে কি সুন্দর মানায়—শিল্প এরই নাম।

আমার হাত টন্‌টন্ করছে, আমি আর পারছি না, দাঁতে দাঁত চেপে গেছে, মুখ চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরুবে, আমি আর পারছি না···না—। আমার ছোট ভাই টাপু ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে, ন্যাড়া ছাদে, পিছোতে পিছোতে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়েও কার্নিস ধরে ফেলে ঝুলছিল, ওর আর্ত চিৎকারে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, কিন্তু টেনে তুলতে পারছি না, চোদ্দ বছরের টাপু এত ভারী, কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছি না, আমার হাত দুটো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে—টাপু একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে আর পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে, আমিও একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি—এবার দু'জনেই পড়বো—তিন তলা থেকে শান বাঁধানো ফুটপাথে—প্রাণ ভয়ে একবার আমার ইচ্ছে হলো টাপুকে ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, টাপুকে—এখান থেকে পড়লে টাপুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—টাপু আমাকে টানছে, জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাতে গেলে দু'জনেই অনেক সময় যেমন মরে—আমিও পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলুম—সেই সময় পিছন থেকে কারা যেন তিন-চারজন আমাকে ধরলো—টাপুকেও টেনে তুললো। ঝড়ের বেগে ছুটে এসে মা

টাপুকে বুকে চেপে ধরলেন। সেই তিন চারজন আমার পিঠ চাপড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কিন্তু ওরা জানে না, আমি এক সময় টাপুকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। টাপুকে ফেলে আমি নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। এমন কিছু অস্বাভাবিক কি? জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বেশীর ভাগ মানুষই শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবে। টাপুকে মেরে ফেলে নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। বেশীর ভাগ মানুষই তাই করতো। আমি বেশীর ভাগ মানুষের দলে। এই সব স্বার্থপর বর্ণকালা, অন্ধ মানুষ কেউই প্রেমিক হতে পারে না! নাঃ, আমি মনীষার যোগ্য নই, সত্যিই। অমল মনীষাকে তুমিই নাও। আমি বিনা দ্বিধায় সরে দাঁড়াচ্ছি। মনীষার সঙ্গে আর কোনোদিনই দেখা করবো না।

পরদিনই মনীষাকে টেলিফোন করলাম। আগে কখনো ওকে এমন ভাবে ডাকিনি। মনি, তুমি আগামীকাল ঠিক ছ'টার সময় লেক স্টেডিয়ামের কাছে আসবে। আসতেই হবে। অন্য হাজার কাজ থাকলেও ক্যানসেল করে দাও!

মনীষা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, আসবো আসবো, ঠিক আসবো, কেন কি ব্যাপার?

—দেখা হলে বলবো, কালই দেখা হওয়া চাই, ঠিক আসবে, উইদাউট ফেইল! কথা দাও আমাকে!

মনীষার গলা কি একটু কেঁপে গেল? একবার কি সে টেলিফোনটা কাছ থেকে সরিয়ে তার অনিন্দ্য দুই ভুরু একটুক্ষণ ভাবলো কিছু? দু'-তিন মুহূর্ত বাদে মনীষা বললো, বলছি তো যাবো? আপনি একটা পাগল!

কাল এলো। অফিস যাইনি। অফিসে গেলেই আত্মায় একটা ময়লা দাগ পড়ে। বিকেলে স্নান করে দাড়ি কামিয়েছি। আয়নার সামনে আমার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ চেহারা। আয়নার সামনে থেকে যেই সরে গেলাম—চোখে ভেসে উঠলো অন্য একটা আয়না। তার সামনে মনীষা, দুটি মাত্র হাতে চুল, চিরুনি, ফিতে এবং আঁচল সামলাচ্ছে—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—তার পাশে আমি—না, না, এটা মানায় না, শিল্প হিসেবে এটা অসার্থক। আমি সরে গেলাম সে ছবি থেকে—অন্য মূর্তি এলো সেখানে—হ্যাঁ, এখন দুটি মুখের আলো একরকম, আমি মানতে বাধ্য।

স্টেডিয়ামের কাছে গেলাম না আমি। অমল মনীষাকে তুমি নাও, আমি তোমাকে দিলাম।

মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে

যায়। গ্রীক-পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা। আর মনীষা? তাকে দেখলে মনে হয়—প্রতি মুহূর্তে অমলকে আরও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজকাল খুব বেশী সিনেমা দেখি। সময় কাটে না বলে প্রায় প্রতিদিনই নাইট-শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। সেইরকমই একদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারোটা আন্দাজ চৌরঙ্গিতে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে অমলকে বেরুতে দেখলুম। সঙ্গে ও কে? অবনীশ না? কি সর্বনাশ, অবনীশের সঙ্গে অমলের চেনা হলো কি করে? খুব যেন বন্ধুত্ব মনে হচ্ছে। অমলের পা টলছে একটু, মদ খেয়েছে, তা থাক্ না, পাইলটের কাজ করে—ওকে কতদেশে যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়—মদ খাওয়া এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু পা না টললেই ভালো ছিল। অবনীশের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব হলো কি করে? অবনীশ সেনগুপ্ত তো সাংঘাতিক লোক। বড়লোকের ছেলেদের বখানোই ওর কাজ। খুব সুন্দর চটপটে কথা বলে, কথার মোহে ভোলায়, বড় বড় হোটেলে এসে মদ খাওয়ার সঙ্গী হয়, তারপর নিজের বাড়ির জুয়ার আড্ডাতে টেনে নিয়ে যায়। এলগিন রোডে ওর কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা, জুয়ার নেশা ধরিয়ে অবনীশ সেই সব ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। আমি একদিন মাত্র ওর পাল্লায় পড়েছিলাম। অমলকে দেখে তো মনে হচ্ছে অবনীশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। রাস্তায় গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে ওপাশে অমলের গাড়িতে উঠলো। অমল নতুন গাড়ি কিনেছে। অমল নিশ্চয়ই অবনীশের স্বরূপ জানে না।

পরদিন এলগিন রোডে অবনীশের বাড়িতে আমি হাজির হলুম। দরজা খুললো, অবনীশের শয়তানী কাজের যোগ্য সঙ্গিনী, তার স্ত্রী—স্বরূপা। স্বরূপার মোহিনী ভঙ্গি অগ্রাহ্য করে আমি অবনীশকে ডাকলুম এবং বিনা ভূমিকায় বললুম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লালবাজারের ডি সি ডি ডি আমার মেসোমশাই হন। আমি আপনার এই বেআইনী জুয়োর আড্ডা এক্ষুণি ধরিয়ে দিতে পারি। লোক্যাল থানায় ঘুষ দিয়ে পার পেলেও লালবাজারকে এড়াতে পারবেন না। কিন্তু সে-সব আমি করবো না, একটি মাত্র শর্তে, আপনি অমল রায়ের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করবেন। তার ছায়াও মাড়াবেন না। সে এখানে আসতে চাইলেও তাকে বাধা দেবেন। মোট কথা অমল রায়কে কোনোদিন আমি এ বাড়িতে দেখতে চাই না। কি রাজী?

অবনীশ হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, আচ্ছা রাজী। কিন্তু অমল রায় আপনার কে হয় ?

—আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সে। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম এ কথাও তাকে বলতে পারবেন না।

আমি নিজে কখনো বাজার করতে যাই না। দু'একদিন গিয়ে দেখেছি, আমি একেবারেই দরদাম করতে পারি না—আমায় সবাই ঠকায়। তবু হঠাৎ একদিন বাজারে যাবার শখ হলো। বাজারে অমলের সঙ্গে দেখা হলো। আশ্চর্য যোগাযোগ। অমলও নিশ্চয়ই কোনোদিন বাজার করে না। বাজারকরা টাইপই ও নয়। যে-লোক এক-একদিন এক এক দেশে থাকে—সে আজ ল্যান্সডাউন রোডের বাজারে এসেছে নিছক কৌতুকের বশেই নিশ্চয়ই। চাকরকে নিয়ে অমল খুব কেনাকাটি করছে। অমল যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিনতে খুব ঠকছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, এবং বেশ মজা লাগলো। অলক্ষ্যে আমি ওর দিকে নজর রাখছিলুম। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে বাজারে, অমলের পায়েও কাদা লেগেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ। একটুর জন্য আমি অমলকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম টম্যাটোর দোকানে কি একটা গোলমাল। তাকিয়ে দেখি সেখানে অমল, রাগে তার মুখখানি টকটকে লাল, অমল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলুম। অমল একবার তরকারিওয়ালাকে বললো, এক চড় মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেবো ! অমল চড় মারার জন্য হাতও তুলেছে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম—এই দৃশ্য দেখে। মনে মনে বললুম, ছি, ছি, অমল, এমন ব্যবহার তো তোমাকে মানায় না ! তরকারিওয়ালাকে চড় মারাটা মোটেই রুচিসম্মত নয়—তার যতই দোষ থাক্ ! যাক্, হয়তো অমল বেশী রাগের মাথাতেই—আমি গিয়ে অমলের পাশে দাঁড়ালুম, মৃদু স্বরে বললুম, অত মাথা গরম করবেন না। তাতে আপনারই—। অমল আমার দিকে তাকালো, চেনার ভাব দেখালো না, কিন্তু আমাকে একজন সাহায্যকারী হিসেবে ভেবে নিয়ে বললো, বুঝলেন তো, আজকাল এই সব রাস্কেলদের এমন বাড় বেড়েছে—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি আরও আঘাত পেলুম· তরকারিওয়ালারও একটা আত্মসম্মান আছে সেখানে আঘাত দেওয়া তো অমলের উচিত নয়। আমি কথায় কথায় ভুলিয়ে অমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এসব ছোটখাটো ব্যাপার ধর্তব্য নয় অবশ্য, অমলের তো এসবের অভ্যেস নেই—হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। ইস্ তরকারিওয়ালা উল্টে

যদি ওকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বসতো !

অন্ধ ভিখারীকে পেরিয়ে গিয়েও মনীষা আবার ফিরে আসে, তারপর ব্যাগ খুলে মনীষা যখন ঝু*কে তাকে পয়সা দেয়—তখন মনে হয়, মনীষা শুধু ওকে পয়সাই দিচ্ছে না, তার সঙ্গে নিজের আত্মার একটা টুকরোও দিয়ে দেয়। মনীষা, তোমার এত বেশী আছে যে অমলের ছোটখাটো দোষ তাতে সব ঢেকে যাবে। অমল দিন দিন আরও তোমার যোগ্য হয়ে উঠবে। আমি তো পারি নি, অমল পারবে।

অমলকে আমি চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করি। বাতাসের তরঙ্গে একটা চিন্তা সব সময় অমলের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করি, অমল, তুমি মনীষার প্রেমিক, এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে রেখো। তোমাকে নিচে নামলে চলবে না।

অফিসের কাজে দমদমের ফ্যাক্টরিতে যেতে হলো দুপুরবেলা। মিঃ চোপরা দিল্লী ফিরে যাবার পরই আমার একটা লিফ্‌ট হয়েছে। অফিস থেকে আমাকে গাড়ি দেবারও প্রস্তাব উঠেছে। শিগগিরই যার গাড়ি হবে তাকে এখন ট্রাম বাসে চড়লে মানায় না। মিশন রো থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে দমদম যাচ্ছিলাম, দমদম রোডের ওপর একটা বেশ বড় ভিড় চোখে পড়লো। একটা মোটরগাড়ি ঘিরে উত্তেজিত জনতা, আমি সেটা পাশ কাটিয়েই যাবো ভাবছিলাম—হঠাৎ হালকা নীল রঙের গাড়িটা দেখে কি রকম সন্দেহ হলো—অমলের গাড়ি না? তাইতো, ঐতো ভিড় ছাড়িয়ে অমলের মাথা দেখা যাচ্ছে। পাইলটের পোশাকে—অমল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে। কি সর্বনাশ! অমলের গাড়ি কোনো লোককে চাপা দিয়েছে নাকি? তা হলে তো ওরা অমলকে মেরে ফেলবে। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, রোক্‌কে রোক্‌কে! ঘ্যাচ্‌ করে ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই আমি দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। চে*চিয়ে উঠলাম, অমল, অমল!

আমাকে দেখে অমল যেন ভরসা পেল, ভিড়ের উদ্দেশ্যে চে*চিয়ে কি যেন বললো। অমলের টাইয়ের গি*ট আলগা, মাথার চুল এলোমেলো। অমলের গাড়িতে একটি যুবতী বসে আছে, মনীষা নয়। যুবতীটির সাজ পোশাকে এমন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে যে এক পলক দেখলেই বোঝা যায় এয়ার হোস্টেস। এয়ার হোস্টেসটিকে অমল নিশ্চয়ই বাড়ি পে*ছৈ দিচ্ছিল।

কোনো লোক চাপা পড়ে নি, চাপা পড়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, টকটকে লাল রক্ত। লোকগুলো কিন্তু মানুষ চাপা পড়ার মতনই উত্তেজিত। অমল চে*চিয়ে বললো, যার ছাগল

সে সামলাতে পারে নি কেন? রাস্তাটা কি ছাগল চরাবার জায়গা? ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচিয়ে বললো, অত তেজ দেখাবেন না, মোটরগাড়ি আছে বলে ভারী ফুটানি···দে না শালাকে দু'ঘা।

অমল আকাশে উড়ে বেড়ায়—এইসব মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, না, না, আমাদের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত। আমরা এই ছাগলটার দাম যদি দিই—

'আমরা' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললুম। কেন না, ছাগলটার দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়ই—অমলের কাছে দৈবাৎ সে টাকা না-ও থাকতে পারে। আমার কাছে দৈবাৎ আছে। টাকাটা আমি তক্ষুণি বার করে দিতে পারতুম। কিন্তু দিলুম না, তাতে নিশ্চয় অমলের অহংকারে লাগবে। আগে দরদাম ঠিক হোক, তারপর না হয় আমি অমলকে ধার দেবার প্রস্তাব করবো। আমাকে না-চেনার ভান করলে কি হয়, অমল আমাকে ঠিকই চেনে, অন্তত এক পাড়ায় লোক হিসেবে চেনে। অমল রুক্ষ গলায় বললো, কেন দাম দেবো কেন? আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলাম, হর্ন দিয়েছি।

—ইঃ উনি হর্ন দিয়েছেন। ছাগলকে হর্ন দিয়েছেন!

—ক্যারদানি কত! পাশে মেয়েছেলে নিয়ে, দিন রাত্তির জ্ঞান নেই! আমি অমলের বাহুতে চাপ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললুম, না, না, দাম দেওয়াই উচিত আমাদের, যার ছাগল তার তো ক্ষতি হয়েছে ঠিকই! কত দাম? ছাগলটার কত দাম বলুন?

ছাগলের মালিক কাছেই ছিল, সে বললো, একশো টাকা।

অমল বললো, একশো টাকা। একটা ছাগলের দাম একশো টাকা? অন্যায় জুলুম করে—

—তবু তো কম করে বলেছি! অন্তত আঠারো কেজি মাংস হবে, বারাসতের হাটে বেচলে।

আমি অমলকে মৃদু স্বরে জানালুম, আমার কাছে টাকা আছে। অমল রুক্ষভাবে বললো, টাকা থাকা না-থাকার প্রশ্ন নয়। জুলুম করে এরা—

লোকগুলো এবার আরও গরম হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আমাদের গা ঘেঁষে আসছে! শুরু হয়েছে গালাগালি। এসব সময়ে কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয় অমলের ধারণা নেই। ওরা আমাদের সবাইকে মেরে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমলও এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে বললো, ঠিক আছে, কত

টাকা দিতে হবে ? কত টাকা ? আমি বললুম, দাঁড়ান, আপনি চুপ করুন, আমি দরদাম ঠিক করছি।

ভিড়ের দু' তিনজন লোক এক সঙ্গে কথা বলছিল, আমি তাদের উত্তর দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দারুণ চিৎকার শুনলাম, পালাচ্ছে, পালাচ্ছে শালা—এই শালাকে ছাড়িস না, ধর্ ধর্ ।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না হঠাৎ একটা সুযোগে অমল গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভিড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল, আমার দিকে তাকালোও না—এক দল লোক হইহই করে ছুটে গেল সেই গাড়ির দিকে, আর একদল আমার কলার চেপে ধরলো। অমলের গাড়িকে আর ধরা গেল না—আমি দু' বার শুধু অমল, অমল বলে চেঁচিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি কাতরভাবে আর্তনাদ করতে লাগলুম, অমল, তুমি যেও না, তুমি যেও না ! এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করবো কি করে ? অমল, তুমি মনীষার এমন অপমান করো না ! তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে, এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার।

দ্বিতীয় মোনালিসা

এবার বোম্বাইতে গিয়েছিলাম প্রায় বছর পাঁচেক বাদে। ওখানে বাঙালী ও মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছে। অনেকদিন পর গেছি বলে প্রায় সকলের সঙ্গেই একবার করে দেখা করতে হয়। নেমন্তন্ন খেতে খেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বিরাট ছড়ানো শহর বোম্বাই, এক মহল্লা থেকে আর এক মহল্লায় আমি ছুটোছুটি করে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াতে লাগলুম।

ফেরার দিন ঘনিয়ে এলো। আরো অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি। টেলিফোনে যাকে বলে ফেলেছি, অথচ হাতে আর সময় নেই। এই জন্যই খুব বড় কোন জায়গায় আমার যেতে বিশেষ ইচ্ছে করে না। সে সব জায়গায় শুধু চেনা লোকেদের সঙ্গেই দেখা হয়, আর কিছু দেখা হয় না। এর চেয়ে কোন নাম-না-জানা ছোটখাটো জায়গায় আমার একা একা বেড়াতে ভালো লাগে।

তবু এর মধ্যে একবার সুমিতাদির বাড়ি যেতেই হবে। উনি অনেক আগে বলে রেখেছেন। ওঁর ওখানে একদিন খেতে হবে। প্রায় রাজনৈতিক নেতাদের মতন ব্যস্ত ভঙ্গিতে আমি এক সকালে অন্য দু' বাড়ি ঘুরে তারপর হাজির হলাম সুমিতাদিদের বাড়িতে। ওঁর স্বামী ডাক্তার, ওঁরা বহু বছর ধরে আছেন বোম্বাইয়ে, সুতরাং বোম্বাইয়ের আশেপাশের কোন্ কোন্ জায়গা আমার দেখা উচিত তা ওঁরা খুব ভালো জানেন, সেই সব জায়গার কথা আমাকে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু আমার আর সময় নেই। আগামী কাল ভোরবেলা আমায় প্লেন ধরতে হবে।

সুমিতাদির ছেলের নাম আনন্দ, সে ছবি আঁকে। বছর কুড়ি-একুশ বয়েস, বেশ সুদর্শন এবং উৎসাহে ভরপুর ছেলেটি। তার দু' একটি ছবি এখানকার প্রদর্শনীতেও স্থান পেয়েছে। সে তার ছবিগুলো দেখাতে লাগল। আমি ছবির খুব একটা সমঝদার নই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ভালো বলাই নিয়ম, তাই বেশ ভালো ভালো বলে যাচ্ছিলাম। চোখে দেখতে ছবিগুলো ভালোই লাগছিল।

একটি বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবি বার করে সে বলল, দেখুন, আমার এই ছবিটা একজিবিশনে প্রাইজ পেয়েছে।

আমি বললাম, বাঃ, এটা তো দারুণ।

ছবিটি লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা'র একটি কপি। রং অবশ্য অন্য রকম। কালো আর নীল রংয়ের ব্যবহারই বেশী। অনেকটা যেন ফটোগ্রাফের নেগেটিভের মত।

আমি প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বলল, আপনি এই ছবিটা নেবেন?

সুমিতাদিও অমনি বললেন, 'হ্যাঁ, ছবিটা সুনীলকে উপহার দে।

আমি প্রবল আপত্তি করে উঠলুম। কারুর বাড়িতে গিয়ে কোন কিছুর প্রশংসা করা মানেই সেই জিনিসটি নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা নয়। এরকম ভাবে কোন জিনিস নেওয়া আমার কাছে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার।

আমি যত না না করতে লাগলুম, ও'রাও ততই জোর করতে লাগলেন। তখন আমাকে দৃঢ়ভাবে বলতেই হল যে ছবিটা নিয়ে আসার পক্ষে অসম্ভব। তার কারণ, এখান থেকে আমাকে আরও তিন জায়গায় যেতে হবে, সব জায়গায় আমি এতবড় একটা ছবি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারব না। তা ছাড়া আমি কলকাতায় ফিরব বিমানে, এই সাইজের একটি ছবি হাতে করে নিতে দেবে না। লাগেজ হিসাবে বুক করলেও ছি'ড়ে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আসল কথাটা হচ্ছে এই, কলকাতায় আমার বাড়িতে অতবড় একটা ছবি টাঙানোর জায়গা নেই। তা ছাড়া, মোনালিসার একটি কপি সম্পর্কেও আমার আগ্রহ প্রবল নয়।

সেদিন নিস্কৃতি পেয়ে গেলাম।

কলকাতায় ফেরার মাস দেড়েক বাদে একদিন একজন অপরিচিত লোক এলেন আমার কাছে। লোকটি বললেন যে, তিনি বোম্বাই থেকে আসছেন এবং তাঁর হাত দিয়ে সুমিতাদি আমার জন্য একটি জিনিস পাঠিয়েছেন।

বিশাল প্যাকেটটি দেখেই আমি বুঝলাম, ওটা সেই মোনালিসার ছবি।

সুমিতাদির ছেলে খুব যত্ন করে বাঁধিয়েছে ছবিটি। এ'কেছেও অনেক পরিশ্রম করে। এবং ছবিটির বেশ কিছু গুণও রয়েছে। সুতরাং এমন একটা জিনিস আমাকে শুধু শুধু উপহার দেওয়ায় আমি তখনও একটু লজ্জা বোধ করলুম।

আমার ছোট ঘরটি বইয়ের র‍্যাকে ভর্তি। দেয়ালে অতবড় একটি ছবি টাঙানোর খুবই অসুবিধে। তা ছাড়া, বড় ছবি দেখতে হয় অনেকটা দূর থেকে, এত ছোট ঘরে এই ছবি মানায় না। কিন্তু উপায় তো নেই। ছবিটা

রাখলাম আমার শোয়ার খাটের পাশেই মাটিতে।

খাটে শুয়ে শুয়ে আমি লিখি বা বই পড়ি। প্রায়ই চোখ চলে যায় ছবিটার দিকে। প্রত্যেকদিন দেখতে দেখতে ছবিটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কোথায় কোন রং ঠিকমত মিশেছে বা মেশেনি, সব আমি এখন ধরতে পারি।

প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে মূল মোনালিসা ছবি রাখা আছে। সাহেবরা এখন উচ্চারণ করে মোনালিজা। কিন্তু বাংলাতে মোনালিসাই চলে গেছে। একদিন সকাল দশটা থেকে আমি ল্যুভর মিউজিয়াম দেখতে শুরু করেছিলাম। অতবড় বিরাট মিউজিয়াম একদিনে দেখা শেষ হয় না। চতুর্দিকে বিশ্ববিখ্যাত সব ছবি ও মূর্তি। বিকেলবেলা গেট বন্ধ হয়ে যাবার ঘণ্টা পড়েছে, তখন খেয়াল হয়েছিল, আরে, এখনো তো মোনালিসাই দেখা হয়নি! গাইডদের জিজ্ঞেস করে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মোনালিসার ছবির সামনে দাঁড়ালাম। সত্যি কথা বলতে কী, আমি হতাশই হয়ে ছিলাম তখন।

যে-কোন ব্যাপার সম্পর্কেই আগে থেকে অনেক কিছু শোনা থাকলে সত্যি চোখে দেখার পর সেটা আর ঠিক মেলে না। কল্পনার কাছে বাস্তব হেরে যায়। এই জন্যই অনেকে তাজমহল দেখতে গেলেও হতাশ হয়।

আসল মোনালিসা ছবিটি খুব একটা বিরাট আকারেরও নয়। আরো অনেক ছবির মধ্যে একটি মাঝারি আকারের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, ওমা, এই সেই বিখ্যাত ছবিটা! কী জন্যে এর এত নাম-ডাক।

এই মৃদুহাস্যমুখী নারীটিকে নিয়ে কতরকম জল্পনা-কল্পনাই হয়েছে এতকাল ধরে। অনেকের মতে, যে-মহিলাটিকে দেখে লিওনার্দো এই ছবিটি এঁকেছিলেন, সে সময় মহিলাটি ছিল গর্ভিণী। পিছনের পাহাড়ের পটভূমিকায় এক চিরকালের নারী। তার মুখের হাসিটির মধ্যে রয়ে গেছে সৃষ্টির রহস্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুমিতাদির ছেলে আনন্দ অবশ্য পুরো ছবিটি আঁকেনি। পিছনের পটভূমিকা সে বাদ দিয়েছে, তার বদলে জুড়ে দিয়েছে একটা কালো রঙের চাঁদ। ঠোঁটের পাতলা হাসিটি নেই, তার বদলে ফুটে উঠেছে এক ধরনের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। কিন্তু মুখের আদলটি ঠিক মোনালিসারই মতন। আর আসল মোনালিসার চেয়েও এই ছবিটি আকারে বড়।

এক এক সময় চমকে উঠি। আমার শিয়রের কাছে একটি মেয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ মনে হয় জীবন্ত। এত কাছে কেউ ছবি রাখে না।

কিন্তু আমাকে রাখতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কোন কোন দিন রাত্রে আলো জেবলে ঘ্নমিয়ে পড়ি, এক সময় ঘ্নম ভেঙে গেলে মনে হয় মোনালিসা আমার মাথার ওপর ঝুঁকে আছে। এক্ষ্ননি যেন বলবে, এই, ওঠো, অন্ধকার কর ঘর !

বাড়িতে যে-সব লোকজন আসে, তারা ছবিটা দেখে নানারকম মন্তব্য করে।

কেউ বলে, বাঃ, বেশ ভালো ছবিটা তো ! কোথায় পেলে ?

কেউ বলে, এটা কার ছবি ? মোনালিসা না ? ঠিক ধরেছি কিনা বল ?

কেউ কেউ প্রথমেই খ্নব সতর্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, এটা কার আঁকা ?

অর্থাৎ যদি এটা আমার নিজের আঁকা হয় কিংবা কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ন বা আত্মীয়ের আঁকা হয়, তা হলে ভালো বলবে। আর যদি শোনে কোন নতুন শিল্পীর, তা হলে বলবে মন্দ না।

একজন আমাকে বলেছিল, মাথার কাছে অত বড় একটা ছবি রেখেছ, তোমার ভয় করে না ?

না, করে না। ছবি দেখলে ভয় করবে কেন ? কিন্তু প্রত্যেকদিন দিনের অনেকখানি সময় ঐ ছবিটা দেখার ফলে ম্নখটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে যায়। যখন তখন চোখ ব্নজলেও আমি ঐ ম্নখটা দেখতে পাই।

এরপর একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হল। কোন একটা জর্নরী কাজে আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাদবপ্নরের দিকে যাচ্ছিলাম, গড়িয়াহাট মোড় পের্নবার সময় বাঁ দিকের ফুটপাতের ওপর দাঁড়ানো একটি মেয়েকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। ম্নখখানা খ্নব চেনা-চেনা। কোথায় যেন দেখেছি।

গোলপার্কে আসবার আগেই আমার মনে হল, ঐ ম্নখ তো ঠিক মোনালিসার মত। সাঙ্ঘাতিক মিল আছে। এ রকম কখনো হয় !

আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি-চালককে বললাম, ট্যাক্সিটা ঘোরাও তো ! সে একটু অবাক হল।

প্নরো গোলপার্কটি ঘ্নরে, গড়িয়াহাট মোড়ের লাল বাতি পেরিয়ে আরও সামনে খানিকটা গিয়ে বাঁক নিয়ে যখন বাঁ দিকে এলাম, তখন সেখানে মেয়েটি নেই। হয়তো এর মধ্যেই কোন বাসে উঠে পড়েছে, কিংবা রাস্তা পেরিয়ে গেছে। তাকে আর দেখা গেল না।

যেতে যেতে আমি ভাবতে লাগলাম, এ কি আমার মনের ভুল ? আমি বাড়িতে সব সময় মোনাসিলার ম্নখ দেখছি বলেই পথে-ঘাটেও এখন মোনালিসা দেখতে শ্নর্ন করেছি ? কিন্তু রাস্তায় তো আরও অনেক মেয়ে দেখি, আর তো

কখনো মনে হয়নি এরকম।

ব্যাপারটা সেখানেই ভুলে গেলাম।

কিন্তু দিন পনেরো পরেই, খুব সম্ভবত সেই মেয়েটিকেই আমি দেখলাম আবার। এবার আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তায়, মেয়েটি চলে গেল ট্যাক্সিতে। একবার মুখ ফিরিয়েছিল আমার দিকে, তাতেই আমি কেঁপে উঠেছিলাম। একেবারে অবিকল সেই মুখ। *মোনালিসার মতনই খানিকটা ভারী চেহারা,* প্রায় গোল ধরনের মুখ, এই রকম গালে সাধারণত টোল পড়ে, খোলা চুল।

ট্যাক্সিটার দিকে আমি সতৃষ্ণ ভাবে চেয়ে রইলাম। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখা গেল না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে আমি ছবির মোনালিসাকে জিজ্ঞেস করলাম, বল তো, সুন্দরী, তোমার মতন দেখতে আর কেউ আছে? থাকতে পারে?

ছবির মোনালিসা যেন স্পষ্ট উত্তর দিল, না নেই, না নেই, থাকতে পারে না, থাকতে পারে না।

আমার ঘরে প্রতি মাসেই বইপত্র বাড়ে। নানান জায়গা থেকে বই পাই। এত ছোট ঘরে রাখবার জায়গা হয় না। ছুটির দিনে বই গুছোতে গিয়ে সারাদিন কেটে যায়। ছবিটাকে এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে রাখি, একবার রাখলাম দরজার পাশে।

সেদিন রাত্রে প্রচণ্ড একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে আলো জেলে দেখলাম, দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখা ছবিটা আছড়ে পড়ে গেছে মাটিতে। বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। উঠে গিয়ে ছবিটাকে দাঁড় করালাম। মনে হল ছবির মোনালিসার মুখে যেন একটা অভিমানের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি তাকে শিয়রের কাছ থেকে সরিয়ে দরজার পাশে রেখে দিয়েছি। সেই জন্য।

যত্ন করে ছবিটার গায়ে হাত বুলোলাম। পড়ে যাবার জন্য ছবিটার কোন ক্ষতি হয়নি অবশ্য। কিন্তু এরকম ভাবে বার বার পড়ে গেলে ফ্রেমটা ভেঙে যাবে।

ছবিটা আবার নিয়ে এসে রাখলাম শিয়রের কাছে। মোনালিসা সুন্দরীর গালে হাত দিয়ে বললাম, রাগ কোর না, লক্ষ্মীটি! আর তোমায় কক্ষনো অন্য জায়গায় রাখব না।

পরদিন সকালে উঠে মনে হল, ছবিটার বড় অযত্ন হচ্ছে। আমার ঘরে এভাবে ফেলে না রেখে বরং কারুকে দিয়ে দেওয়া উচিত। কাকে দিই?

চেনা-শোনা অনেকেই ছবি ভালোবাসে, কেউ বা রীতিমত ছবির বোদ্ধা। তাদের যে-কোন একজনের কাছে প্রস্তাবটা তোলা যায়। কিন্তু ঠিক কাকে যে প্রথমে বলব, সে বিষয়েই মনস্থির করতে পারি না।

আজ হঠাৎ মনে পড়ল দেবেশদার কথা। দেবেশদা একজন নাম-করা ডাক্তার কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত একটি ব্যতিক্রম। তিনি দারুণ ভালোবাসেন গান, ছবি, কবিতা—এইসব। সারাদিন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু রাত আটটার পর আর রুগী দেখতে চান না পারত-পক্ষে। নেহাত কোন মরণাপন্ন কেস এলে তিনি দেখেন, নইলে বলে দেন, এখন আমার ছুটি। সারাদিন অসুস্থ লোকের সঙ্গে কাটালে আমি নিজে বেঁচে থাকার আনন্দটা পাব কখন? কলকাতা শহরে একমাত্র দেবেশদার চেম্বারেই আমি রবীন্দ্র-রচনাবলী দেখেছি। রুগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি একটু রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে নেন।

রাত আটটার পর দেবেশদার চেম্বারে খুব জোর একটা আড্ডা হয়। মাঝে মাঝে মাঝে সেখানে গেছি আমি। তখন সেখানে একদম অসুখের কথা আলোচনা হয় না। হয় শুধু সুখের কথা। কেউ এসে গান গায়, কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে। দেবেশদা নিজেও প্রায়ই আমাদের মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ স্বরচিত কবিতা শোনান। সেগুলি অবশ্য কবিতা হিসেবে এমন কিছু নয়, কিন্তু তাঁর উৎসাহটা দেখবার মত।

একদিন দেবেশদার আড্ডাখানায় কথায় কথায় কথায় বললাম, দেবেশদা, তুমি একটা ছবি নেবে? তোমার চেম্বারের এই দিকে দেয়ালটা ফাঁকা আছে, এখানে ছবিটা মানাবে।

কী ছবি?

আমি ছবিটার পরিচয় দিলাম। দেবেশদা সব শুনে আবেগের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই। রুগী দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ছবিটার দিকে তাকালে আমার মন ভালো হবে। রুগীদেরও মন ভালো লাগবে। যা, যা, নিয়ে আয়।

দু'একদিনের মধ্যেই আমি ছবিটা পেঁাছে দিলাম।

তারপর থেকে আমার ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। ঘরে ঢুকেই মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন নেই! তবু এতদিন একটি নারীর সঙ্গ পেতাম এখন ঘরটা শূন্য মনে হয়। এক একদিন বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরে আমার ঘরের আলো জেবলে হঠাৎ মনে হয়, আমার খাটের মাথায় সামনে মোনালিসাকে দেখতে পাবো। কিন্তু সেখানে একটা বইয়ের গাদা জমে গেছে। একটু একটু মন খারাপ লাগে।

হয়তো ঐ ছবিটার টানেই আমি দেবেশদার আড্ডায় ঘন ঘন যেতে লাগলাম। কথা বলতে বলতে প্রায়ই ছবিটার দিকে তাকাই। মনে হয়, মোনালিসা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যেন তার মুখে একটু অভিমানের পাতলা ছায়া নতুন করে লেগেছে। আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, সেই জন্য অভিমান? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমার তো আর কিছু করার ছিল না। এখানে ছবিটা পাঠিয়ে দিয়ে বরং অনেক ভালো হয়েছে। দেখছে অনেক। মোনালিসা যদি একজন জীবন্ত মেয়ে হত, তবে সে শুধু একজনের হত। কিন্তু শিল্পকীর্তি সকলের জন্য।

দেবেশদা ছবিটা পেয়ে খুব খুশী। আমাকে প্রায়ই বলেন, জানিস প্যারিসে একবার একটা কনফারেন্সে গিয়ে আমি আসল ছবিটা দেখেছিলাম। এই ছবিটা অবশ্য সেটার মতন নয়, অনেক কিছু বাদ গিয়েছে।

আমি বললাম, একজন আধুনিক শিল্পী এঁকেছে তো, সে তো খানিকটা নিজস্ব চিন্তা মেশাবেই।

দেবেশদা বললেন, ঠিক। একালের কোন ছেলে যদি পুরনো কালেরই অনুকরণ করে তা হলে আর সে আধুনিক কেন? সে তো নতুন কিছু করবেই। ঐ যে কালো রঙের চাঁদটা এঁকেছে ওটা সত্যি দারুণ!

আমি অবশ্য ঐ চাঁদের ব্যাপারটা খুব একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ভালো মনে করিনি। তবু চুপ করে রইলাম।

দেবেশদা বললেন, আমার কাছে যখন রুগীরা আসে, আমি প্রথমেই এ ছবি সম্পর্কে একটা লেকচার দিই। রুগীদের মন যদি কিছুক্ষণের জন্য অন্তত রোগ থেকে সরানো যায়, তা হলেই অর্ধেক চিকিৎসা হয়ে যায়, বুঝলি না? সবাইকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, এই মুখটা কার বলুন তো? বেশীর ভাগ লোক বলতে পারে না। সব ইডিয়েট তো! এদেশের লোকের তো ছবি দেখার চোখ নেই। স্কুল-কলেজে যারা লেখাপড়া শেখে তারাও শিল্প সম্পর্কে কিছু জানে না। অথচ আমরা ভারতীয়রা নাকি দারুণ সংস্কৃতিবান।

দেবেশদা শিল্প সম্পর্কে এক লম্বা লেকচার দিলেন, আর ততক্ষণ আমি মোনালিসার দিকে চেয়ে রইলাম। যেন আমি আমার এক পুরনো প্রেমিকাকে দেখছি।

দেবেশদা আবার বললেন, বিশেষ করে এই ছবিটা নিয়ে আমি বেশীক্ষণ কথা বলি প্রেগনেন্ট মেয়েদের—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, দেবেশদা, আপনিও তাহলে বিশ্বাস করেন যে মোনালিসা একটি গর্ভবতী মেয়ের ছবি ?

দেবেশদা জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই ! এই চোখের নীচের জায়গা দুটো দ্যাখ, ঠিক প্রেগনেণ্ট মেয়েদের এরকম হয়। তারপর দ্যাখ মেয়েটির যা বয়স, সেই তুলনায় তার বুক দুটো অনেক বড়। তার মানে প্রায় ন'মাস। আর এর যে পোশাক, ইয়োরোপে পোয়াতী মেয়েরাই এ রকম পোশাক পরে।

আমি বললাম, তা ঠিক।

দেবেশদা বললেন, সবচেয়ে বড় হচ্ছে এর হাসিটা। আহা ! এ যেন বিশ্বপ্রকৃতি ! যে প্রকৃতি মানুষের জীবন-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রাণ সৃষ্টির যে কী অপূর্ব আনন্দ ! সেইজন্যই আমি আমার কাছে যে সব পোয়াতী মেয়েরা আসে, তাদের বলি, আপনাদের যা কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে সব ভুলে যান। এরকম ভাবে একটু হাসতে শিখুন তো !

আমি বললাম, দেবেশদা, জান, কলকাতার রাস্তায় আমি একটি মেয়েকে দেখেছি, তাকে দেখতে ঠিক মোনালিসার মতন !

দেবেশদা হা হা করে হেসে উঠলেন। আমার কাঁধে একটা প্রবল চাপড় মেরে বললেন, তোরা কবিরা বড্ড রোমাণ্টিক ! এরকম মুখ বাস্তবের কারুর সঙ্গে কক্ষনো মেলে না ! ইয়োরোপেই এরকম মুখ আর একটিও দেখা যায় না, কিন্তু তুই দেখতে পেলি কলকাতা শহরে ? হা-হা-হা !

সব গল্পের শেষেই একটা চমক থাকে। আজকাল চমক ছাড়াও অন্য রসের গল্প লেখা হয়, কিন্তু এর মধ্যে আমি নিজেই একটা দারুণ চমক খেলাম বলেই সেটা লিখতে হবে আমাকে।

একদিন বিকেলের দিকে দেবেশদার চেম্বারে যেতে হল আমাকে। আমার ছোটমাসীর একটা ব্লাড রিপোর্ট দেখাবার জন্য। এই সময়ে দেবেশদার চেম্বারে বেশ ভিড় থাকে। অন্তত দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমার তো এতসময় অপেক্ষা করলে চলবে না। ভেতরে একজন রুগী আছে বলে আমি দেবেশদার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কানাইয়ের হাত দিয়ে একটা শ্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে বসে রইলাম।

ডাক্তারদের চেম্বারের বাইরে ওয়েটিং রুমে অনেক রকম পুরনো পত্র-পত্রিকা থাকে। সে রকম একটি পত্রিকা আমি তুলে নিতে যাচ্ছি এমন সময় পাশ থেকে আর একজন মহিলাও ঠিক সেই পত্রিকাটি নেবার জন্যেই হাত বাড়ালেন।

আমি তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, নিন না আপনি, নিন।

মহিলাটি আমার দিকে তাকালেন। তখনই আমি আমূল চমকে উঠলাম। এই মহিলাটিকেই আমি একদিন গড়িয়াহাট মোড়ে আর একদিন চলন্ত ট্যাক্সিতে দেখেছিলাম। সেই মোনালিসার মুখ।

বেশ স্বাস্থ্যবতী, সচ্ছল চেহারার মেয়েটি। মুখে আধুনিক আভিজাত্যের চিহ্ন। সে কোন কথা না বলে পত্রিকাটি তুলে নিল। সে কিংবা তিনি। মেয়েটির চেহারার মধ্যে তুমির বদলে আপনি আপনি ভাব আছে। আমার ঠিক পাশেই বসে আছেন বলেই আমি তাঁর দিকে ভালো করে তাকাতে পারছিলাম না। একটু দূরে বসলে ভালো হত!

একটু পরেই দেবেশদা আগের রুগীটিকে ছেড়ে দিয়ে চেম্বারের দরজা খুলে বললেন, আয় সুনীল, ভেতরে আয়!

আমি ভেতরে ঢুকেই নিজের কাজের কথা বলবার বদলে উত্তেজিত ভাবে ফিসফিস করে বললাম, দেবেশদা আপনাকে বলেছিলাম না, একটি মেয়েকে ঠিক মোনালিসার মতন দেখতে!

দেবেশদা খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, কোন মেয়েটি?

আমি বললাম, আমি যেখানে বসেছিলাম, ঠিক তার পাশের মেয়েটি।

দেবেশদা চেম্বরের দরজা খুলে উঁকি মেরে এলেন। ফিরে এসে বললেন, তোর মাথা খারাপ! ও তো রুচিরা সান্যাল, জাস্টিস পি সান্যালের মেয়ে। ওর সঙ্গে তুই মোনালিসার কোন্ মিল খুঁজে পেলি?

—কেন, আপনি পেলেন না?

—কিসের মিল? কোন মিল নেই!

আমি ছবির মোনালিসার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অনেকটা মিল আছে। একই রকম থুতনি, একই রকম চাহনি, একই রকম ওষ্ঠের রেখা।

দেবেশদা বললেন, ডাকব ওকে? তুই ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাস?

আমি বললাম, না, না, আমি আর কী কথা বলব!

দেবেশদা মোনালিসার ছবিটার দিকে তাকালেন একবার। তারপর একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুই যখন কথাটা তুললিই তখন তোকে একটা কথা বলি। বলা উচিত নয়, তবুও বলছি। রুচিরা এখানে কেন আসে জানিস?

আমি কৌতূহলী চোখে তাকালাম।

দেবেশদা বললেন, ও গর্ভপাত করতে চায়। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, ও শোনেনি। ও করাবেই। আমারও কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে, ওর যুক্তিটাই ঠিক। বোধহয় ওর গর্ভপাত করানোই উচিত।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কেন?

দেবেশদা বললেন, তুই রুচিরা সান্যালের নাম শুনিস নি? কাগজে একবার বেরিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে গত বছর ওকে পুলিসে অ্যারেস্ট করেছিল। জেরা করার সময় নানারকম বীভৎস অত্যাচারে ও অজ্ঞান হয়ে যায়। সে সব অত্যাচারের কথা আর তোকে শোনাতে চাই না। তারপর যখন ও বেল-এ ছাড়া পেল তখনই টের পেল যে ও গর্ভবতী। ওর গর্ভে এক চরম অন্যায়ের সন্তান। বাবা কে, তাও ও জানে না। এই সন্তানকে ও কোনোদিনই ভালো মনে নিতে পারলে না। তাই ও চায়…এ সম্পর্কে তুই কী বলিস?

আমার কিছু বলার নেই, আমি চুপ করে রইলাম।

দেবেশদার কাছে কাজ সেরে বেরিয়ে আসবার সময় আমি সেই মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকালাম। একটি পত্রিকা আড়াল করে সে বসে আছে। হ্যাঁ, এখন দেখলে বোঝা যায়, মেয়েটি গর্ভবতী। কিন্তু ওর মুখে কী, রাগ না দুঃখ না ঘৃণা না উদাসীনতা? অথবা সব মিলিয়ে অন্য একটি রূপ? আমি শিল্পী নই। আমার একটুও ক্ষমতা নেই ছবি আঁকবার। তবু আশা করে থাকব, নতুন কালের কোন শিল্পী নিশ্চয়ই একদিন এই মেয়েটির ছবি শাশ্বত করে রেখে দেবে।

স্বপ্নের একটি দিন

মনোলীনার মাথায় যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন আসে। কখন যে সে কোন কথাটা বলবে, তার কোন ঠিক নেই। প্রসঙ্গ বদলে ফেলতে তার এক মুহূর্তও লাগে না। সেই জন্যই মেয়েটিকে বড় বেশী রহস্যময়ী মনে হয়।

শুভ্র ভর দুপুরবেলা ওর সঙ্গে এসেছে গঙ্গার ধারে। বেশী ভিড় নেই এখন এখানে। চার পাঁচ জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে সেখানে। আর কিছু অলস চেহারার মাঝবয়েসী লোক, পৃথিবীর সমস্ত পার্কে বা বেড়াবার জায়গায় এই ধরনের কিছু লোককে বসে থাকতে দেখা যায়। তবুও অনেক বেঞ্চ খালি। কিন্তু একটাও পছন্দ নয় মনোলীনার। বেশ সুন্দর, গাছের ছায়ার নীচের ফাঁকা বেঞ্চ দেখেও সে বলছে, উঁহু, এখানে নয়!

শুভ্র হেসে বলল—তোমার যদি বসতে ইচ্ছে না করে, আমরা হেঁটেও বেড়াতে পারি। আমার রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটতে ভাল লাগে।

মনোলীনা জিজ্ঞেস করল—হাঁটু পর্যন্ত কাদার মধ্যে তুমি হেঁটেছ কখনও?

শুভ্র বলল—হ্যাঁ! কেন হাঁটবো না!

—শেষবার কবে? এমনি কলকাতা শহরের কাদা নয়। হাঁটু পর্যন্ত কাদা!

শুভ্র একটু মুশকিলে পড়ল। ঠিক বলা শক্ত, শেষবার কবে সে কাদার মধ্যে দিয়ে হেঁটেছে। বারবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। যেন শুভ্র একটা বাচ্চা ছেলে, ইচ্ছে করে কাদার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে, কোন এক অচেনা নদীর ধারে।

শুভ্র সময় নিচ্ছে দেখে, মনোলীনা বলল—থাক্ বলবার দরকার নেই।

—মনে পড়েছে! একবার সুন্দরবন গিয়েছিলাম···নৌকো থেকে নেমে-দারুণ কাদা···ঝিনুকের টুকরোয় আমার পা কেটে গিয়েছিল।

—কতদিন আগে?

—আট ন বছর হবে। দাঁড়াও, হিসেব করে দেখছি, না, ঠিক এগার বছর আগে।

—তখন আমি ফ্রক পরতাম।

মনোলীনার বয়েস কুড়ি একুশের বেশী নয়। শুভ্রর বয়েস প্রায় চল্লিশ হয়েছে, বেশ কিছু পাকা চুল দেখা যায়। ওদের দেখলে কেউ ঠিক প্রেমিক-

প্রেমিকা ভাববে না। ওরা তা নয়ও বোধ হয়।

শুভ্র জিজ্ঞেস করল কফি খাবে? দোকানটা খোলা আছে দেখেছি।

মনোলীনা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল—আমি কোথায় জন্মেছি জান? তুমি যদি জিজ্ঞেস কর, আমি কোথায় জন্মেছি, তা হলে আমি বলব—রাস্তায়।

—তার মানে?

—আন্দাজ কর।

—ট্রেনের মধ্যে? প্লেনে? গাড়িতে যেতে যেতে?

—না, হল না।

—তা হলে? এ তো খুব শক্ত ধাঁধা দেখাচ্ছ?

—আমি তোমাকে আমার জন্মস্থান দেখিয়েও দিতে পারি। সেটা সত্যিই একটা রাস্তা।

—ব্যাপারটা কী, খুলে বল।

—আমরা তখন দুবরাজপুরে থাকতাম। মানে আমার মা আর বাবা থাকতেন। আমি তো তখন পৃথিবীতে ছিলামই না। তারপর আমি জন্মালাম। একটা ছোট্ট সুন্দর সাদা একতলা বাড়ী। এখন সে বাড়িটা নেই। সেই বাড়িটা ভেঙে এখন সেখান দিয়ে একটা রাস্তা হয়েছে। বাস যায়, ট্রাক যায়।

মনোলীনা খুব হাসতে লাগল। তারপর হাতের বইগুলো ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে—এখানে বসবে?

শুভ্র বলল—না। রোদ্দুরের মধ্যে আমি হাঁটতে পারি, কিন্তু বসে থাকতে ভাল লাগবে না।

মনোলীনা বলল—তা হলে ঐ গাছের নীচে। মোট কথা মাঠে বসব, বেঞ্চিতে না।

গাছটার তলায় গিয়ে মনোলীনা বসলেও না, সোজা শুয়ে পড়ল। জায়গাটা খুব পরিষ্কার নয়, কিছু আখের ছিবড়ে পড়ে আছে। দু একটা আইসক্রিমের গেলাস। মনোলীনা সে সব গ্রাহ্য করল না।

শুভ্রর একটু অস্বস্তি লাগছে। একটা মেয়ে মাঠের মধ্যে এ রকম ভাবে শুয়ে থাকলে পথচারীরা ফিরে ফিরে তাকাবেই। তবু শুভ্র ঠিক করল, সে মনোলীনার কোন ইচ্ছেতেই বাধা দেবে না।

—আমি যখন জন্মাই, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

শুভ্র একটু হিসেব করে নিয়ে বললে—খুব সম্ভব বিলেতে। আমি উনিশ বছর বয়েসে বিলেতে গিয়েছিলাম পড়তে।

—অনেকদিন ছিলে ?

—প্রায় দশ বছর।

—আর তুমি যখন জন্মাও, তখন আমি কোথায় ছিলাম ?

শুভ্র এবার হাসলে। এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন কোনো মেয়ের কাছে থেকে কখনো শোনে নি শুভ্র। সে যখন জন্মায়, তখন মনোলীনা কোথায় ছিল।

শুভ্র বলল—ঐ যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে না। 'ইচ্ছা' হয়ে ছিলে মনের মাঝারে— ! তোমার নামটাও এদিক থেকে খুব সার্থক।

—তুমি কবিতা পড় বুঝি ?

—কেন, ইঞ্জিনিয়ারদের বুঝি কবিতা পড়তে নেই ? এখন অবশ্য সময় পাই না,, কিন্তু এক কালে পড়তাম।

—বিলেতে যাবার আগে তুমি কোনো মেয়ের প্রেমে পড় নি ?

—না। বিলেত যাবার পরই।

—তুমি ইংরিজিতে প্রথম প্রেম করেছো ?

—তাও না। বিলেতে গিয়ে আমি একটি বাঙালী মেয়েরই প্রেমে পড়েছিলাম।

—সেই মেয়েটিই হাসিদি ?

—উঁহু। হাসিকে আমি বিয়ে করেছি দেশে ফিরে এসে।

—তা হলে সেই মেয়েটি, যাকে তুমি প্রথম ভালবেসেছিলে। তাকে তুমি বিয়ে করলে না, নাকি সেই তোমাকে বিয়ে করল না ?

—সেই আমকে বিয়ে করল না। তার বদলে সে টুপ করে মরে গেল।

—তাকে তোমার মনে আছে ? তার মুখটা মনে আছে ?

—হ্যাঁ, সব মনে আছে।

—কত বয়েস ছিল তার, যখন সে মরে যায় ?

—প্রায় তোমারই বয়েসী ছিল।

—সেই জন্যই আমার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হয়, আমি যদি এখন মরে যাই, তা হলে আমাকে অনেক অনেকে অনেকে দিন মনে রাখবে ঃ নইলে, আমি সকলের কাছেই একদিন না একদিন পুরনো হয়ে যাব।

—মনোলীনা, তুমি সত্যিই একটা অদ্ভুত মেয়ে !

মনোলীনা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে পটাং পটাং করে কয়েকটা ঘাস ছিঁড়ল। তারপর সেগুলো শুভ্রর কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—তোমাকে যে আজ ডেকে আনলাম, সে জন্য তুমি রাগ করেছ?

শুভ্র বলল—না, রাগ করব কেন? তবে একটু অবাক হয়েছি ঠিকই।

—অবাক হওয়াটা তো খুব ভাল। আমার মানুষকে অবাক করে দিতে খুব ভাল লাগে।

—আমরা তো আজকাল চট করে অবাক হই না।

—জীবনে আমরা যতবার অবাক হই, তার চেয়ে অনেক বেশীবার রেগে যাই, তাই না? অথচ আমরা কেউ রাগতে চাই না। অবাক হতেই চাই।

মেয়েটি এত সুন্দরভাবে কথাটা বলল যে শুভ্র একটা তীব্র খুশী বোধ করল শরীরে। তার ইচ্ছে করল, মেয়েটিকে আদর করতে। কিন্তু এই দুপুরবেলা খোলা মাঠের মধ্যে…তাছাড়া মনোলীনার সঙ্গে তার পরিচয় মাত্র কয়েক দিনের।

তবু সে হাত বাড়িয়েমাটির ওপর ছড়িয়ে থাকা মনোলীনার একটা হাত চেপে ধরল। মনোলীনা হাত সরিয়ে নিল না, তার কোমল হাতের স্নিগ্ধ উত্তাপ উপহার দিল শুভ্রকে! তারপর বলল—তুমিও শুয়ে পড় না এখানে!

শুভ্র ভুরু উঁচু করে বলল, শুয়ে পড়ব!

—হ্যাঁ, কেন, তোমার ইচ্ছে করছে না? টাই আর কোট পরে তোমায় মজার দেখাচ্ছে। কোটটা খুলে ফেলে মাথার বালিশ করে নাও!

—হঠাৎ মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ব?

এমনিতেই শুভ্রর চেনাশুনো কেউ তাকে এই দুপুরবেলা মাঠের মধ্যে বসে থাকতে দেখলে আঁতকে উঠবে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারবে না। শুভ্রজ্যোতি সেনগুপ্ত একজন বিরাট ব্যস্ত মানুষ। বিলেত থেকে ফেরার পরে শুভ্র কিছুদিন সরকারি দপ্তরে কাজ করেছিল, তারপর নিজের ফার্ম খোলে। সারা ভারত জুড়ে তাদের কাজ কারবার, এমন কি মালয়েশিয়াতেও কাজ করছে কিছু। কাজের ব্যাপারে শুভ্র দারুণ সিরিয়াস। তাছাড়া, সে হাল্কা স্বভাবের মানুষ নয়। সে নেশা করে না, বা মেয়েদের পেছনে ছোটাছুটি করে না। গোপনে যদি নারীদের উপভোগ করতে চাইতো সে, তা হলেও তার কোনো অসুবিধে ছিল না। প্রায়ই তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়, টাকা দিয়ে সে মেয়েদের কিনতে পারে। কিন্তু শুভ্রর সে রকম কোনো ইচ্ছে হয় না। বিবাহিত জীবনে সে পরিতৃপ্ত।

মনোলীনার সঙ্গে তার আলাপ মাত্র কয়েকদিন আগে। তার ছোট শ্যালিকার বান্ধবী এই মেয়েটি। একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে প্রথম পরিচয় হয়। সেদিন উৎসব ভাঙতে বেশ রাত হয়েছিল। তার ছোট শ্যালিকা বলেছিল, শুভ্রদা, তুমি একটু আমার বান্ধবীকে ওর বাড়িতে পেঁছে দেবে? অনেক রাত হয়ে গেছে, ওকে একা একা যেতে হবে···।

হাসির জ্বর হয়েছিল বলে সেদিন সে নেমন্তন্ন বাড়িতে আসে নি। গাড়িতে আরও কয়েকজন লোক উঠেছিল, সবাইকে নামাতে নামাতে গিয়েছিল শুভ্র। মনোলীনার বাড়ি সবচেয়ে শেষে। মনোলীনার বাড়ির সামনে এসেও গাড়ির মধ্যে অন্তত আধ ঘণ্টা কথা বলেছিল দুজনে। প্রথম আলাপেই মনোলীনা তাকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছিল। আজকালকার মেয়েরা বোধহয় এ রকমই বলে।

সেদিন মনোলীনা বলেছিল—তুমি সবাইকে বাড়ি পেঁছে দিলে, কিন্তু কারুর সঙ্গে একটাও কথা বললে না কেন?

শুভ্র অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল—কথা বলিনি? কই, বললাম তো!

—সে তো শুধু ভদ্রতার কথা। সবাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাল, তুমি তার উত্তরে ভদ্রতা দেখালে। তুমি অন্য কথা ভাবছিলে? তুমি বুঝি সব সময় কাজের কথা ভাবো?

প্রথম দিনের আলাপেই কেউ এ রকম ভাবে কথা বলে না। তাছাড়া, একটা কলেজে-পড়া বাচ্চা মেয়ে···তার তুলনায় শুভ্র রীতিমত একজন দায়িত্বপূর্ণ ভারিক্কি লোক।

সেদিন গাড়ি থেকে নামবার সময় মনোলীনা বলেছিল—পাইপ খাও, এক এক সময় তোমার চোখ বুজে যায়—আমি লক্ষ্য করেছিলাম। যারা লোকজনের মাঝখানে চোখ বুজে পাইপ টানে, তাদের সেই সময়টায় খুব বোকা বোকা দেখায়।

শুভ্র এ কথা শুনে রাগ করবে না বিরক্ত হবে, ঠিক করতে পারছিল না। মনোলীনা তক্ষুনি আবার বলেছিল—এবার থেকে চেষ্টা করে চোখ খুলে রেখো···তুমি তো আর সত্যি সত্যি বোকা নও!

শুভ্র এরপর তার ছোট শ্যালিকা জয়িতাকে বলেছিল—তোমার বান্ধবীটি ভারী অদ্ভুত তো! কী রকম যেন কথা বলে···

জয়িতা বলেছিল—ঐ মনোলীনা তো, কলেজে ওকে অনেকে পাগলী বলে—

কিন্তু দারুণ ভাল মেয়ে। মনটা একেবারে সোনার মতন।

দু'তিনদিন বাদেই মনোলীনা একদিন ওদের বাড়িতে এসে হাজির। কয়েক মিনিটেই হাসির সঙ্গে তাঁর দারুণ ভাব হয়ে গেল। কোন রকম আড়ষ্টতা না দেখিয়ে সে ঘুরে ঘুরে দেখল সব কটা ঘর। শুভ্রর ঘরের দেয়ালে একটা ছবি বাঁকা হয়ে ঝুলেছিল, সেটাকে সোজা করে দিল। চা খেল তিন কাপ। তখন টেলিভিশানে সিনেমা শুরু হবার কথা, তাকে বলা হল সিনেমা দেখে যেতে। কিন্তু সে তক্ষুনি হাতের বইগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—না, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে!

সে কেন এসেছিল, কেন হঠাৎ চলে গেল, কিছুই বোঝা যায় নি। সে যাবার পর দেখা গেল, একখানা বই সে ফেলে গেছে।

আজ সে হঠাৎ শুভ্রর অফিসে এসে হাজির। শুভ্র তখন বোর্ড মিটিং-এ ব্যস্ত ছিল। অন্য যে কেউ হলে সে দেখাই করত না। কিন্তু হাজার হোক একটি যুবতী মেয়ে এবং ছোট শ্যালিকার বান্ধবী, সুতরাং পুরোপুরি অবজ্ঞা করা যায় না। হাতের কাজ খানিকটা সরিয়ে রেখে সে মনোলীনাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কী ব্যাপার?

যেন কতকালের চেনা, এই রকম ভাবে মনোলীনা বলেছিল, তোমার অফিসটা দেখতে এলাম! একজন মানুষকে শুধু নেমন্তন্ন বাড়িতে দেখলে চেনা যায় না। নিজের বাড়িতে, অফিসে সে নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা মানুষ!

শুভ্র বলেছিল, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ তো খানিকটা আলাদা হয়ে যায়ই। এতে আর আশ্চর্য কী আছে?

—তুমি আমার সঙ্গে একটু বেরুবে? গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাব।

শুভ্র আকাশ থেকে পড়েছিল। অফিসে হাজার ব্যস্ততার মধ্যে নিশ্বাস ফেলার পর্যন্ত সময় থাকে না। অন্যের অফিস নয় যে শুভ্র মাঝে মাঝে ফাঁকি মারবার চেষ্টা করবে। এটা তার নিজের অফিস। তাছাড়া দুপুরবেলা গঙ্গার ধারে বেড়ানো···সে তো কলেজের ছেলেদের ব্যাপার।

শুভ্র বলেছিল, তোমার গঙ্গার ধারে বেড়াতে ইচ্ছে করছে···আমার সঙ্গে ···কেন, তোমার নিজের বন্ধু টন্ধু নেই?

মনোলীনা বলেছিল, কেন থাকবে না, অন্য অনেকের সঙ্গেই তো বেড়াতে যাই···আজ তোমার সঙ্গেই যেতে ইচ্ছে করছে, তুমি যাবে না?

শুভ্র বলতে যাচ্ছিল, না, এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার। অফিসের জরুরী

কাজকর্ম ফেলে সে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যাবে? মনোলীনা সরল ঝকঝকে দুটি চোখ মেলে তাকিয়েছিল তার দিকে। যেন এই মেয়েটিকে কিছুতেই আঘাত দেওয়া যায় না।

তখন হঠাৎ শুভ্র ভেবেছিল, একদিন নিয়মের ব্যতিক্রম করলেই বা ক্ষতি কী? দেখাই যাক না, এই মেয়েটি তার কাছে কী চায়। অফিসের সমস্ত লোককে বিস্মিত করে শুভ্রজ্যোতি সেনগুপ্ত দুপুর তিনটের সময় বেরিয়ে পড়েছিল একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ের সঙ্গে।

শুভ্র বলল, আমি টাই পরে আছি বলে তোমার খারাপ লাগছে। আচ্ছা, খুলে ফেলছি।

মনোলীনা বলল, তুমি এই মাঠের ওপর শুয়ে পড়তে লজ্জা পাচ্ছো? কিন্তু, শুয়ে থাকলে কতখানি আকাশ দেখা যায়···শুয়ে আকাশ দেখা মানুষের ভাগ্যে খুব কম হয়···

শুভ্র খুলে ফেলল কোটটা। সেটা সাবধানে ভাঁজ করে রেখে সেও শুয়ে পড়ল, হচ্ছে যখন, ছেলেমানুষির চূড়ান্ত হোক। এই অবস্থায় শুয়ে থাকা আইনবিরুদ্ধ কিনা কে জানে! যদি তাদের পুলিশে ধরে।

মনোলীনা পাশ ফিরল শুভ্রর দিকে। শুভ্রর বুকের ওপর সে নিজের এক হাত রেখে বলল, তুমি জান না, তোমার মুখখানা এখন একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে! তুমি নিজেই দেখলে বোধ হয় চিনতে পারবে না।

শুভ্র বলল, আমি এখন সত্যিই একটা অন্য মানুষ!

—তুমি ফুল ফোটা দেখেছ?

—ফুল ফোটা মানে? কী ফুল?

—যে কোন ফুল। গাছে প্রথমে একটা কুঁড়ি এল, তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু করে সেটা ফুটল, একদিন পুরোপুরি ফুল হল, তারপর আবার ঝরে গেল···

—না দেখিনি···ফুল অনেক দেখেছি, ফুলের মালা···ফ্লাওয়ার ভাসে সাজান ফুল।

—ফুলের চেয়েও ফুল ফোটা দেখতে বেশী ভাল লাগে।

—কী করে দেখবে বল···আমরা শহুরে মানুষ।

—অনেক বাড়ির ছাদে ফুলের টব থাকে।

—হাসি কয়েকটা টব রেখেছিল ছাদে, তারপর ঠিক মতন যত্ন নিতে পারেনি।

—তুমি যত্ন করোনি ?

—আমি ? আমার সময় কোথায় ?

একটি অল্পবয়েসী বাচ্চা এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। পয়সা চাইছে। গাছতলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বাতাসের মধ্যে শুয়ে থেকে শুভ্র যেন সত্যিই এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। এ সময় ভিখিরির উৎপাত তার ভাল লাগল না। ভিখিরিদের বিদায় করার সবচেয়ে ভাল উপায় দুটো চারটে পয়সা দিয়ে বিদায় করা। কিন্তু একজনকে দিলেই আরও আসবে। তাছাড়া, শুভ্রর কাছে একেবারেই খুচরো পয়সা নেই।

—এই যাও।

কিন্তু ছেলেটি যাবে না। বিরক্তি সৃষ্টি করাই তার অস্ত্র। শুভ্র বেশ জোরে বকুনি দিল ছেলেটিকে।

মনোলীনা তার ছোট্ট ব্যাগ খুলে একটা দশ পয়সা বার করে শুভ্রর হাতে দিয়ে বলল—এই নাও!

মনোলীনা তো নিজেই ভিক্ষে দিতে পারতো ছেলেটিকে। তার বদলে পয়সাটা সে শুভ্রর হাতে দিল কেন ? শুভ্র একটু ক্ষুণ্ণ হল। খুচরো পয়সা থাকলেও সে তো পুরো একটা টাকাই দিয়ে দিতে পারত ছেলেটিকে। তার কাছে এক টাকার দাম কিছুই নয়।

মনোলীনা কি ঐ দশ পয়সা শুভ্রকেই ভিক্ষে দিল ? পয়সাটা সে ছুঁড়ে দিল ছেলেটির দিকে। বলল—এরপর আরও ছেলেরা আসবে।

মনোলীনা বলল—আমার কাছে আরও খুচরো পয়সা আছে।

টাটকা হাওয়ায় শুভ্র জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। এমন কি তার পাইপ ধরাবারও ইচ্ছে হল না। এতক্ষণে সে একবারও পাইপ খায়নি।

—মনোলীনা, আমার মনে হচ্ছে আমি তোমার সমান বয়েসী হয়ে গেছি!

—তুমি বুঝি নিজেকে খুব বড় ভাব ?

—বয়েসের দিক থেকে তো বটেই, সেটা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই! তাছাড়া আমি ভীষণ একটা কাজের জগতে, ব্যস্ত জগতে ঢুকে গিয়েছিলাম···কোনদিন দুপুরবেলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি···তুমি ভাগ্যিস আমাকে ডেকে আনলে···তা তোমার কাছে আমি কতটা কৃতজ্ঞ।

—আমরা অনেকে এ রকম প্রায়ই আসি···শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখি।

—আমাকে তোমাদের দলে নেবে ?

উত্তর না দিয়ে মনোলীনা হাসল শুধু। শুভ্রর ইচ্ছে করল, ঐ নির্মল হাসিটুকু সে মনোলীনার ওষ্ঠ থেকে চেটে নেয়। এ রকম ইচ্ছে তার আগে কখনো হয়নি। আজ সে বাচ্চা বয়েসের মতন উত্তেজনা বোধ করছে।

মনোলীনা বলল—তুমি এমন কোন জায়গা জান, যেখানে কোন অশান্তি নেই, দুঃখ নেই, হিংসে নেই, লোভ নেই।

শুভ্র বলল—সে রকম জায়গা পৃথিবীতে আবার আছে নাকি ? আমার তো মনে হয় না।

—আছে।

—আছে ? কোথায় ? তুমি সে রকম জায়গা খুঁজে পেয়েছ ?

—না, এখনো খুঁজে পাইনি। কিন্তু কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়ই··· যতদিন সে জায়গাটা খুঁজে না পাই, ততদিন মনে মনে সে রকম জায়গা বানিয়ে নিতে পারি···এ রকম আকাশের নীচে শুয়ে, চোখ বুজে···তুমি চোখ বুজে দেখো···

শুভ্র সত্যিই চোখ বুজল। অমনি তার মনে পড়ে গেল অফিসে ফেলে রেখে আসা কাজের কথা। সে বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের ওপর। সব কিছু ভুলে যেতে চাইল। একটু পরেই মনে হল, সে বুঝি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমের মধ্যে একটা লোভহীন, হিংসাহীন শান্তিময় জায়গা আছে বটে।

শুভ্র উঠে বসল। মনোলীনা তখনও চোখ বুজে আছে। এই মেয়েটি তার কাছে কী চায় ?

—মনোলীনা, সত্যি করে বল তো, তুমি আমাকে এখানে ডেকে আনলে কেন ?

—এমনিই।

—এমনিই ? কিন্তু···যদি আমার নেশা ধরে যায় ? যদি আমি বারবার তোমার সঙ্গে এখানে আসতে চাই ?

—তা তুমি চাইবে না !

—যদি চাই ?

—আমাকে ডেকো, আমি আসবো !

—কিন্তু কেন আসবে ? আমি তোমার কে ? তোমার নিশ্চয়ই অনেক সমবয়েসী বন্ধু-বান্ধব আছে···ইস্, পাঁচটা বাজল, আমাকে অফিসে যে একবার

ফিরতেই হবে।

—চল, ফিরে যাই।

—যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে, একবার অন্তত, কিছু বলে আসিনি…আমি না ফেরা পর্যন্ত অনেকে বসে থাকবে।

—চল।

—তুমি কোন দিকে যাবে?

—আমি অন্যদিকে…একটু এগুলেই বাস পেয়ে যাবো।

—আমি ট্যাক্সি নিচ্ছি, তোমায় কোথাও নামিয়ে দেবো?

—না।

—তুমি আর কখনো নিজে থেকে এসে আমায় ডাকবে?

—কী জানি!

—আজ তবে কেন এলে? কেন হঠাৎ ডাকলে?

—এমনিই ইচ্ছে হল।

—মনোলীনা, তুমি এত সুন্দর…তুমি আজ আমাকে কী চমৎকার দুটি ঘণ্টা উপহার দিলে…যদি আবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই…কিংবা যদি আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই।

—মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, এই তো স্বাভাবিক।

—সেরকম ভালবাসা নয়…আমি যেন তোমাকে বহুকাল ধরে চিনি, তুমি আর আমি খুব কাছের মানুষ।

—চোখ বুজে পাশাপাশি শুয়ে থাকলে এই রকম মনে হয়। তারপর চোখ খুলে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর সেটা ভেঙে যায়।

মনোলীনা চট করে উঠে দাঁড়াল, তারপর শুভ্রর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—ওঠো, তোমার দেরি হয়ে যাবে।

শুভ্রর পিঠে ধুলো লেগেছিল, মনোলীনা সযত্নে ঝেড়ে দিল পিঠটা। শুভ্র যেন শিশু একটা। তারপর শেষ বিকেলের রঙীন আলোর মতন ঝলমলিয়ে হেসে মনোলীনা বলল, যারা খুব কাজের মানুষ, কিছুক্ষণের জন্য তাদের কাজ ভুলিয়ে দিতে আমার খুব ভাল লাগে।

—আবার দেখা হবে?

—হ্যাঁ, যখন তোমার ইচ্ছে হবে।

আর দেরি করা যায় না। শুভ্রকে এগিয়ে আসতেই হল রাস্তার দিকে।

সহজেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। কিন্তু মনোলীনা কিছুতেই রাজি হল না সেই ট্যাক্সিতে চাপতে। সে হাঁটবে। শুভ্রর ট্যাক্সি ঘুরে গেল উল্টো দিকে। পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। মনোলীনা মাথা নীচু করে হাঁটছে আস্তে আস্তে। যেন সে দিগন্তের মধ্যে মিলিয়ে যাবে।

পাইপ জ্বালবার জন্য কোটের পকেটে হাত দিয়ে অন্য কী যেন টের পেল শুভ্র। এক মুঠো ঘাস। মনোলীনা এক সময়ে তার পকেটে ভরে দিয়েছিল সেগুলো ফেলে দিতে গিয়েও ফেলল না শুভ্র। অফিসে ফিরে এসে রেখে দিল নিজের ড্রয়ারে।

তারপর আবার আগেকার মতন দিন কাটতে লাগল, সেই একঘেয়ে ব্যস্ততায়। এক সপ্তাহের মাথাতেই তাকে অফিসের কাজে যেতে হল দিল্লি। ফিরে এল দু'দিন বাদেই। মনোলীনা আর আসে নি। মনোলীনার কথা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় শুভ্রর। এক এক সময় বুকটা মুচড়ে ওঠে।

মনোলীনাকে যখন সে জিজ্ঞেস করেছিল, আবার দেখা হবে? তার উত্তরে সে বলেছিল, যখন তোমার ইচ্ছে হবে। শুভ্রর কি ইচ্ছে হয় না? কিন্তু ইচ্ছেটাই সব নয়!

মনোলীনা তার কাছে কিছু চায় নি। শুভ্র খুব ভালমতন ভেবে দেখেছে মেয়েটির অন্য কোন মতলব ছিল না। সে শুভ্রকে প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমে পড়তে চায় নি। শুভ্রর টাকা পয়সা, প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু সে সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখায় নি মনোলীনা। একটা পয়সা খরচ হয় নি তার জন্য। বরং মনোলীনাই দশটা পয়সা দিয়েছিল শুভ্রর হাতে। যেন সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক, সেইভাবে বলেছিল, আরও অনেক খুচরো পয়সা আছে।

মনোলীনা আর কিছু চায় নি, শুধু তার ইচ্ছেটুকু চেয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছেটাই সব নয়। ইচ্ছে থাকলেও শুভ্র আর গঙ্গার ধারে মাঠের ওপর দুপুর-বেলা শুয়ে থাকার সময় করতে পারে না। মনোলীনাকে খুঁজে বার করার চেষ্টাও সে করে নি। তার ছোট শ্যালিকা জয়িতা কাছে মনোলীনার খোঁজ নিতে লজ্জা পেয়েছে। এমন কি মনোলীনার বাড়িও সে চেনে। একদিন মাঝ রাত্রে পেঁাছে দিয়েছিল। কিন্তু শুভ্র কি হঠাৎ মনোলীনার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলতে পারে, তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে চল। তা হয় না। সে শুভ্রজ্যোতি সেনগুপ্ত, দারুণ ব্যস্ত মানুষ এসব ছেলেমানুষি তাকে মানায় না।

মাঝে মাঝে টেবিলের ড্রয়ার খুলে সে সেই ঘাসগুলো দেখে। শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তবু থাক। শুভ্রর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সেই গাছের তলায় ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা দুপুরবেলা, তার বুকের ওপর মনোলীনার একটা হাত, সেই দৃশ্যটা যেন স্বপ্ন মনে হয়। কিন্তু স্বপ্ন তো নয়, ঘাসগুলো রয়েছে।

মনোলীনা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি যখন জন্মেছিলে, তখন আমি কোথায় ছিলাম? শুভ্র বলেছিল, 'ইচ্ছা হয়ে ছিলে মনের মাঝারে'।

এখন, শুভ্রর বুকের মধ্যে মনোলীনা একটা ইচ্ছে হয়েই রইল।

দেবদূতের ভয়

দেবদূত এসে বললো, চলো।

আমি চমকে উঠে বললাম, সে কি। এর মধ্যেই? এত তাড়াতাড়ি?

দেবদূত ঈষৎ কৌতুক, খানিকটা বেদনা মিশিয়ে হেসে বললো, সবাই এই কথাই বলে। সকলেই ভাবে, ঠিক সময়ের আগেই আমি পৌঁছে গেছি।

—একটু তৈরি হয়ে নেবারও সময় পাবো না?

—তৈরি হবার কিছু নেই। সঙ্গে তো কিছুই নেবে না।

শেষ-সম্মান রাখবার জন্য আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিক আছে, চলো।

—তোমার শরীরটাকে এখানে রেখে যাও। শরীরের আর প্রয়োজন নেই।

এই মায়াময় শরীরে একটি হাত বুলিয়ে, ঠিক যেন মাতৃস্নেহে নিজেকে একটু আদর করে নিয়ে বললাম, দাও, আমাকে এই শরীর থেকে বিযুক্ত করে দাও!

পুকুরের ভাঙা ঘাটের ওপর ভিজে পোশাকের মতন পরিত্যক্ত হলো শরীর, আমি তার সঙ্গে নেমে গেলাম জলে। পদ্ম পাতার ওপর যেমন ফড়িং খেলা করে, সেই রকম ভাবে আমরা শরীরহীন ভাবে ওড়াউড়ি করতে লাগলাম।

সামান্য কৌতুহলে দেবদূত ফের আমাকে প্রশ্ন করলো, কিছু সাধ না-মেটা রয়ে গেল? কিছু অতৃপ্তি? কোনো সুপ্ত বাসনা? কোনো নিষিদ্ধ কামনা? খ্যাতির জন্য কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম?

আমি চক্ষুহীন দৃষ্টিতে তার দিকে কয়েক নিমেষ তাকিয়ে থেকে বললাম, নারী সম্পর্কে আমার চিরকাল অতৃপ্তি থেকে যাবে। রূপ সম্পর্কে তৃষ্ণা। সেসব কিছু না। জানি, আমি অমর হবো না। শুধু একটুখানি আফসোস, একটা খেলা একটু বাকি রয়ে গেল।

—কোন্ খেলা? পাশা খেলা? সে বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না। মৃত্যুর সঙ্গে পাশা খেলার বিখ্যাত উপাখ্যান আমি জানি।

—না, পাশা খেলা নয়। অন্য। আমি মাটিতে একটা বীজ পুঁতেছিলাম, তার থেকে চারা গাছ হলো, সেই গাছে ফুল হলো, ফল হলো, ফল থেকে আবার

বীজ। পুনরায় সেই বীজ থেকে গাছ। এই রকম চলছিল। তারপর একদিন সেই গাছে যখন ফুল ফুটে আছে, আমি তাকে বললাম, থামো! ফুল অমনি থেমে গেল। সে সৌরভ ছড়াতে লাগলো, তার পাপড়ি আর ঝরে পড়লো না, চাঁদের আলো ও রোদ এসে তার ওপর লুটোপুটি খেয়ে মিনতি জানাতে লাগলো, ফুল, তুমি ঝরে যাও, ঝরে যাওয়াই তোমার নিয়তি। কিন্তু ফুলটি তেমনি অম্লান হয়ে আছে।

—এর থেকে তুমি কী বলতে চাও?

—এটা কোনো রূপক নয়। এটা একটা ঘটনা। কিংবা আমার নিজস্ব খেলাও বলতে পারো। সেই ফুলটিকে মুক্তি দিয়ে আসা উচিত আমার।

—তুমি ফিরে যাও।

—তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে? এখানে, এই পুকুরের ধারে। আমি ভদ্রলোক, আমি কথা দিচ্ছি, আমি ঠিক ফিরে আসবো।

জল থেকে পাড়ে এসে, দ্রুত প্যাণ্ট জামা পরবার মতন শরীরটাকে আবার নিজের ওপর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে গেলাম। গাছ থেকে ফুলটাকে ছিঁড়ে পাপড়িগুলো উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায়। প্রতিটি পাপড়ি তাদের নিজস্ব পথে চলে গেল। গাছটাকে উপরে তুলে টুকরো টুকরো করে হত্যা করলাম তাকে। তখনও ফুলের ফিকে গন্ধটুকু রয়ে গেছে। সেই গন্ধের উদ্দেশ্যে বললাম, বিদায়!

আবার ফিরে এলাম সেই জলাশয়ের কাছে। কিন্তু সেখানে দেবদূত নেই তো। তার যে অপেক্ষা করার কথা ছিল! অনেকবার ডাকলাম তার নাম ধরে। কোনো উত্তর নেই।

সে চলে গেল কেন? সে কি ভয় পেয়েছে? কিসের ভয়।

আমিই বা এখন কোথায় যাব? আমি সব ছেড়ে এসেছি, আমারও তো আর ফেরার পথ নেই!

দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি

লাল মিঞা

কত বড় জবরদস্ত মানুষ যে লাল মিঞা, তার প্রমাণ একবার তিনি হাসেমকে এমন একখানা কান চাপাটি ঝাঁপড় মেরেছিলেন যে সেই থেকে হাসেম আর বাঁ কানে শুনতেই পায় না। তখন থেকে তার নাম এক কেনো হাসেম। তার সেই নামের মধ্যে লাল মিঞার কীর্তি স্থায়ী হয়ে রইলো। এক কেনো হাসেম এখন লাইনের চায়ের দোকানে কাজ করে। ছোঁড়াটা এমন মজার যে যদি সে বাঁ দিক ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন যতই তাকে ডাকো, সে শুনতে পাবে না। তখন তাকে ধরে ঘুরিয়ে দিতে হয় ডান দিকে।

লাল মিঞার আর একখানা কীর্তির কথা লোকের মুখে মুখে ঘোরে। এই গ্রামে প্রথম নাইলন সুতোর ছিপ এনেছিলেন লাল মিঞা। সেই ছিপ পেতে বসেছিলেন বারো শরিকের পুকুরে। এই পুকুরে যার খুশী ছিপ ফেলে মাছ ধরুক, কিন্তু কেউ চুপচাপে জাল ফেললেই কাজিয়া লেগে যাবে। বারো শরিকের কারুর বাড়ি বিয়ে-শাদী হলে তখনই দেওয়া হবে জাল ফেলার অধিকার।

বিরাট পুকুর, মাছ আর পদ্ম পাতায় ভরা। দুপুরবেলা লাল মিঞার ছিপের নীল রঙের সুতোয় টান পড়লো। অমনি বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো হুইল। মাছটা সারা দিঘি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। টান দিতে গিয়ে লাল মিঞা ভাবলেন, ওরে বাপস, এটা মাছ না জল দানব? লাল মিঞা নিজে সা-জোয়ান। গাজীর নাম নিয়ে জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই টাল সামলাতে পারলেন না, পড়ে গেলেন জলে। লাল মিঞা জীবনে কখনো হারেন নি। জলের মধ্যে লেগে গেল লড়াই। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। লাল মিঞার সারা গায়ে জড়িয়ে গেছে নাইলনের সুতো, সে আর কিছুতেই ছেঁড়ে না, তিনিও উঠে আসতে পারেন না, অন্যদিক থেকে জল দানব তাঁকে টানছে।

শেষ পর্যন্ত লাল মিঞারই জয় হলো। তিনি দু'হাতে বুকের মধ্যে তাঁর শত্রুকে সাপটে ধরে এক সময় উঠে এলেন। এই অ্যাত্ত বড় কালো হাঁড়ির মতন মাথা, ড্যাবা ড্যাবা চোখ, একটা বিরাট কাৎলা মাছ। পরে

ওজন নিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক আট কেজি। অত বড় একটা মাছের সঙ্গে জলের মধ্যে কুস্তি করে কেউ ধরে আনতে পেরেছে, এমন কথা ভূ-ভারতে কখনো শোনা যায় নি। আশে পাশের দশখানা গাঁয়ের মধ্যে এখনো কেউ বড় মাছ ধরলেই লোকে বলে, আরে যা যা, রেকট করেছিল বটে লাল মিঞা, এখনো তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার হেম্মৎ কেউ দেখাতে পারে নি।

তবে, এসব লাল মিঞার যৌবনের কথা। এখন তাঁর আসল জোর মামলায়। জমি-জিরেত নিয়ে লাল মিঞার সঙ্গে একবার যে মামলায় জড়াবে, তার গুষ্টির তুষ্টি নাশ হয়ে যাবে।

রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরছেন লাল মিঞা। পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর সাদা মখমলের পাঞ্জাবি। পায়ে রবারের পাম্প শু, হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় হড়হড়ে কাদা। তার মধ্য দিয়ে গভীর আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে হাঁটছেন তিনি। অন্য যে-কেউ আছাড় খেয়ে পড়তে পারে, কিন্তু লাল মিঞা? সে তো একটা বাঘ।

গ্রামে এখন নিশুতি রাত। এর মধ্যে লাল মিঞার টর্চের আলো এদিক ওদিক ঝিলিক দিচ্ছে। পেয়ারাতলীর পাশে একটি একটেরে ঘর, সেখান থেকে হঠাৎ শোনা গেল একটি কচি শিশু গলার কান্না।

ঘৃণায় লাল মিঞা মুখ ব্যাঁকালেন।

রহমান সাহেবের বাড়িতে অতিথি এসেছেন চারজন। রহমান সাহেব কলকাতায় সেটলমেণ্ট অফিসে চাকরি করেন। সপ্তাহে একবার বাড়ি ফেরেন, প্রায়ই তাঁর সঙ্গে মেহমান থাকে। আসার পথে আড়বেলের হাট থেকে গোস্ত কিংবা বড় মাছ কিনে আনেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে গান বাজনা হয়। রহমান সাহেবের বাবা মাত্র ছ মাস আগে এন্তেকাল করেছেন। তিনি ছিলেন ভারী কড়া লোক। তিনি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তেন এবং দান ধ্যান করতেন নিয়মিত। তাঁর আমলে পঁয়তিরিশ বছর বয়স্ক রহমান সাহেবও বাড়িতে থাকতেন মুখ বুজে। এখন তিনি যেভাবে চলছেন, তাতে লোকে বলে, বাপের বিষয় সম্পত্তি তিনি দু'দিনেই উড়িয়ে দেবেন।

রহমান সাহেবের স্ত্রী নাজমা পোয়াতী। আম্মার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এত লোকের রান্না বান্না করবে কে? বাড়িতে যে ছোট মেয়েটি বাসন মাজতে

আসে, তাকে নাজমা বললো, যা তো, হাসিনাকে ডেকে নিয়ে আয় !

পাঁচ মিনিটের রাস্তা। ডাক পেয়েই হাসিনা ছুটতে ছুটতে চলে এলো।

হাসিনা আল্লার এক অপূর্ব সৃষ্টি। সকলেই জানে, তার বয়েস ত্রিশ একত্রিশের কম নয়। কিন্তু দেখায় ঠিক ষোলো-সতেরো। খুব বেশী মনে হয় তো কুড়ি। রংটি কালো, কিন্তু সেই কালোর ওপরেই যেন চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে। শরীরের গড়ন পেটনও খুব মজবুত। সে কখনো হাঁটে না, সব সময় দৌড়ে দৌড়ে চলে। আর এ মেয়ের কত গুণ ! হাতখানা যেন মধু। যা রাঁধবে তাতেই এমন সোয়াদ আসবে যে সবাই চেয়ে চেয়ে খাবে। হাসিনাকে পানি এনে দিতে বলো, পুকুর থেকে দশ ঘড়া পানি তুলে দেবে, তারপরও মুখখানা তার হাসি হাসি থাকে। সারা বাড়ি মুছে ঝকঝকে তকতকে করে দেবে সে, একবার বলতেও হবে না।

হাসিনা বড়-মানুষের দুঃখী মেয়ে। পাড়ায় কারুর বাড়িতে বড় কাজকর্ম থাকলে হাসিনার ডাক পড়ে। সে দু হাতে সতেরো হাতের কাজ করে দেয়। দোতলায় পুকুরের ধারের ঘরটিতে রহমান সাহেব তাঁর মেহমানদের নিয়ে বসেছেন, কখনো হেঁকে পানি চাইছেন, কখনো কাবাব, কখনো একটা দেশলাই, হাসিনা ছুটে ছুটে গিয়ে দিয়ে আসছে সব কিছু। একতলার রান্নাঘরে বসে থাকলেও সে দোতলার হাঁক একবারেই ঠিক শুনতে পায়। কখনো সে দোতলায়, কখনো সে পুকুর ঘাটে, কখনো রান্না ঘরে, কখনো বা সে রহমান সাহেবের মাকে পান ছেঁচে দিচ্ছে। মুখের হাসিটি লেগে আছে ঠিক।

দরজার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে সে বললো, এই নিন রহমানভাই, আপনি দেশলাই চেয়েছিলেন।

রহমান সাহেব বললেন, ভেতরে আয় না, এত লজ্জা কী ?

উঠে গিয়ে তিনি হাত ধরে হাসিনাকে টেনে নিয়ে এলেন ভেতরে। তাঁর চারজন দোস্তের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এ আমার এক দূর সম্পর্কের বোন হয়। আসলে এ আমার এক শত্রুর মেয়ে। ওর বাবার সঙ্গে আমার মামলা চলছে। ওর বাবা অতি ঘোড়েল লোক, কিন্তু এ মেয়েটা খুব ভালো। আচ্ছা, বলুন তো, এর বয়েস কত ?

হাসিনাকে নিয়ে এই খেলাটা সবাই খেলে। বয়েস হলে মানুষের মুখে তার একটা ছাপ পড়বেই। শুধু হাসিনা ব্যতিক্রম।

অতিথিদের মধ্যে কেউ বললো আঠারো, কেউ বললো কুড়ি। এদের মধ্যে

যার নিজেরই বয়েস অনেক কম, সেই মীজানুর বললো, কত আর হবে, পনেরো, ষোলো।

রহমান সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কালো রঙের মেয়ে, তার ওপর পরে আছে একটি কালো শাড়ী। হাসিনা যেন রাত্তিরের সঙ্গে মিশে আছে।

রহমান সাহেব মীজানুরকে বললেন, এর বড় ছেলেটারই বয়েস বোধহয় চোদ্দ পনেরো। নারে হাসিনা? এর ছেলেমেয়ে কটি জানেন? তিনটে না চারটে রে?

হাসিনা আঙুলে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, তিন।

সবাই খুব বিস্ময় প্রকাশ করলো।

রহমান সাহেব বললেন, মীজানুর, তুমি তো বিয়ে শাদী করোনি এখনও? একে বিয়ে করবে? কি রে হাসিনা, তোর পছন্দ হয় আমার এই বন্ধুকে? মুখ তুলে দ্যাখ ভালো করে। একে নিকে করবি?

হাসিনা ঘাড় কাৎ করে বললো, হুঁ!

রহমান সাহেব বললেন, দেখছেন তো, স্বভাবটা ওর একদম বাচ্চার মতন? এরকম বিয়ে-পাগলী মেয়ে আর আমি দেখিনি! একেও অনেকেই বিয়ে করতে চায়। তবে একটা বড় কঠিন শর্ত আছে! সেটা শুনলেই পিছিয়ে যায় সবাই!

লাইনে সন্ধ্যা

কলকাতা শহর থেকে মাত্র সত্তর মাইল দূরে হলেও এদিকে ট্রেন চলে না, এদিকে বিদ্যুৎ পেঁৗছোয় নি। তবে দেড় মাইল হাঁটা পথের পর বড় রাস্তা, সেখান দিয়ে অনেক বাস চলে। এখানে বাস রাস্তাকেই বলে লাইন। যেখানে বাস থামে, তার নাম স্টেশন।

বিকেলের পর গাঁয়ের অনেকেই একবার লাইনের দিকে ঘুরে আসতে যায়। এখানে কিছু দোকানপাট আছে। এখানে এসে কিছুক্ষণ বসলে পাঁচরকম কথা শোনা যায়। কেউ কেউ শখ করে এখানে চা খেতে আসে। বসিরহাট কিংবা এদিকের আড়বেলের বাজারে মাছের দাম, পাটের দাম, আলুর দাম কত, তাও জানাজানি হয়ে যায় এখানে।

সবচেয়ে ঝলমলে দোকানটি বীরেন সাহার। সুচ সুতো থেকে শুরু করে

ফুটবল পর্যন্ত পাওয়া যায়। সামনে সাজানো সারি সারি কাচের বৈয়ামে নানারকম লজেন্স ও বিস্কুট। এক একবার বাস এসে থামে আর বীরেন সাহা চোখ তুলে দেখে। শহরে কে কে গিয়েছিল, কে কোনরকম জিনিসপত্র নিয়ে এলো সঙ্গে করে।

দোকানের সামনে সাত থেকে তেরো বছর বয়েসের তিনটি ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, মেয়েটিই ছোট। তিনজনই পরে আছে ছোট ইজের, খালি গা ওরা। চোখ দিয়ে লজেন্স বিস্কুটগুলো চাটছে।

বীরেন সাহা মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে ওঠে, এই, যা যা। কেন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছিস ?

ওরা নড়ে না। মেয়েটার নাক দিয়ে সিকনি গড়াচ্ছে, মেজ ছেলেটা ঘ্যাসর ঘ্যাসর চুলকোচ্ছে উরু, সেখানে পাঁচড়া হয়েছে। বড় ছেলেটা ছটফটে ভাবে এদিক ওদিক তাকায় সর্বক্ষণ। তার রোগা ক্যাংলা চেহারা, কিন্তু মুখ চোখ দেখলেই বোঝা যায় বেশ বুদ্ধি আছে। তার নাম জাভেদ।

বীরেন সাহা আবার তাড়া দিয়ে উঠলো, এই, যা যা সর দোকানের সামনে থেকে।

ওরা তবু নড়লো না। ওরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর। রাস্তাটা কারুর কেনা নয় !

দোকানে খদ্দের আসছে, যাচ্ছে। একটু ফাঁকা হলেই বীরেন সাহার চোখ পড়ে ঐ দিকে। সর্বক্ষণ হ্যাংলার মতন চেয়ে থাকা ঐ তিনটে বাচ্চাকে দেখতে কারুর ভালো লাগে ? একটা নুলো ভিখিরি এসে ভিক্ষে চেয়ে পাঁচ নয়া নিয়ে গেল। ওরা ভিক্ষেও নেবে না।

শেষ পর্যন্ত বীরেন সাহা কাচের বৈয়াম খুলে তিনটে শস্তা লজেন্স বার করে বললো, এই নে, এদিকে আয়, নে তারপর যা !

ছেলেমেয়ে তিনটে তবু এগোলো না। পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো একবার, কিন্তু নড়লো না কেউ।

—এ যে দেখছি মহাজ্বালা !

একটু পরেই মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেল বীরেন সাহা। বসিরহাটের দিক থেকে একটা বাস এসে থামলো, তার থেকে নামতে দেখা গেল লাল মিঞাকে।

বীরেন সাহা বললো, ঐ লাল মিঞা আসছে !

জাভেদ পেছন ফিরে তাকিয়ে সত্যিই রাস্তার ওপারে লাল মিঞাকে দেখতে পেয়ে কেঁপে উঠলো। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতন অমনি গ্রামের দিকে ছুটলো পাঁইপাঁই করে। তার ভাই বোনও তার পেছনে পেছনে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

যারা শুধু চাষবাস নিয়ে আছে, তাদের ভাগ্যের বিশেষ উত্থান পতন নেই। কোনো কোনো বছর খুব খারাপ যায়, কোনো কোনো বছর খারাপ দিনগুলোও সয়ে যায়। হঠাৎ কোনো বছর যদি পাটের দাম একটু চড়ে, বাজারে আগে ভাগে পাট পেঁাছোনো যায়, তা হলে হাতে কিছু উটকো টাকা আসে। সেই টাকায় ঘরের ছাউনি বদলানোটা হয় সেবার।

গণি খান চৌধুরী তাঁর ভাই রহিমের মতনই আলাদা আলাদা জমি চাষ করে আসছিলেন। এক বছর তিনি খেয়ালের বশে পাট বেচা টাকায় জলকর ডেকে নিলেন। সেবার থেকেই তাঁর ভাগ্য ফিরলো। আজকাল মাছের ভেড়িতেই সোনা ফলে।

এখন গণি চৌধুরীর দোতলা কোঠা বাড়ি সে বাড়িতে রেডিও আর বন্দুক আছে। তাঁর হাতে সোনার ব্যাণ্ডের হাতঘড়ি আছে। দেশলাই এর বদলে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরান। তাঁর পাঁচ ছেলে, সবাই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। দুই ছেলে দেখে চাষবাস, আর দুই ছেলে পড়ে থাকে ভেড়িতে। ছোট ছেলেটি ইস্কুলে যায়। গণি চৌধুররীর ইচ্ছে আছে সামনের বছর ফেরী ঘাটের নিলামের সময় ডাক দেবেন।

বয়েস হলেও গণি চৌধুরীর শরীরটা মজবুত আছে। দুই বিবিই গত হয়েছেন অকালে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তিনি আর নতুন করে শাদীর কথা ভাবেন না। ছেলেরা তাঁর যত্নআত্তির কোনো ত্রুটি রাখেনি, তাঁর কাজের বোঝাও হালকা করে দিয়েছে। তিনি এখন পরোপকার করে বেড়ান। মসজিদ সংস্কার, গ্রামে প্রাইমারি স্কুল গঠনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন, মাদ্রাসার শিক্ষকদের বকেয়া বেতন এসব ব্যাপারে গণি চৌধুরীর সব সময় খুশী। তেঁতুলগাছের পীর সাহেবের মাজারের সামনে তিনি নিজ ব্যয়ে বসিয়ে দিয়েছেন টিউকল, কাজী কবির ইন্তেকালের পর যে ফাংশান হলো তাতে তিনি প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। কেউ বলতে পারবে না নতুন টাকার গরমে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। তিনি দয়ালু মানুষ। গাঁয়ে রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যান, সকলে

সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

সন্ধের দিকে গণি চৌধুরীর একটু জ্বর এসেছে। প্রায়ই এরকম ঘুষঘুষে জ্বর আসে। ডাক্তারকে দেখাতে যাবেন যাবেন করেও হচ্ছে না। চাষীর রক্ত আছে শরীরে, যখন তখন ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা এখনো রপ্ত করতে পারেন নি। তাঁর দোস্ত গীয়াসুদ্দিন আহমদের জানাজায় যাবার কথা ছিল, তিনি আর গেলেন না। দোতলায় নিজের ঘরে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলেন না। ছটফট করছেন। কেমন যেন শয্যাকণ্টকীর ভাব। একবার উঠছেন, একবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন বিছানায়। বাড়িটা নিঝুম, ছেলেরা কেউ নেই বাড়িতে। দু ছেলের বউ নিশ্চয়ই গেছে পাড়া বেড়াতে।

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এখান থেকে দেখা যায়, তাঁর নিজের বাড়ির চৌহদ্দি, তারপর ফলবাগান, নিজস্ব পুকুর, অনেক দূর বিস্তৃত ধান জমি। সবই তাঁর নিজের জীবনে গড়া। পুকুরের ওপারে তাঁর ভাই রহিমের কাঁচা বাড়িটি যেমন আগে ছিল তেমনিই আছে।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এত করেও কী লাভ হলো? সন্ধেবেলা এই যে তাঁর শরীর ছনছন করছে, এই সময় পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই। কেউ তাঁর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে আসবে না। শরীরে এত তাকৎ অথচ শরীর থাকে অনাহারে।

তিনি হতাশভাবে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। যদি এই সময় কেউ এসে পাশে বসতো, দুটো সোহাগের কথা কইতো! দুই প্রাক্তন বিবির মধ্যে একজনের কথাও গণি চৌধুরীর মনে পড়লো না, তিনি ভাবতে লাগলেন আর একজনের কথা, বড় কোমল তার মুখখানা, তার হাতের আঙুলে যেন জাদু।

হাসিনার পূর্ব ইতিহাস

ষোলো বছর বয়েসে হাসিনার চেহারা যখন ঠিক ষোলো বছরের মেয়ের মতই ছিল, সেই সময় সে এক সন্ধেবেলা লাইনের ধার থেকে মেল বাসে উঠে পালায়। হাসিনা পাকতে শুরু করেছিল তের বছর বয়েস থেকে। তার বাড় বাড়ন্ত শরীরের জন্য পাড়ার চাচা আর দুলহাভাইরা একটু গোপন ফুরসৎ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। এইভাবে হাসিনার শরীর গরম হয়ে গেল। ষোলো বছর বয়েসে একটি লম্বা চওড়া ছেলে তাকে হাতছানি দিতেই সে সরে পড়লো তার সঙ্গে।

দোর্দণ্ড প্রতাপ লাল মিঞা মেয়ের খোঁজে চতুর্দিকে লোক লাগালেন। বেশী দূরে নয়, হাসিনাকে পাওয়া গেল ইটিণ্ডাঘাটে। ছেলেটি সেখানে ফলের ব্যবসা করে, তার নাম জামালুদ্দীন।

লাল মিঞা ছেলেটিকে টুঁটি ধরে নিয়ে এলেন। মেয়েকে দিলেন বিষম মার। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বদ নসীবের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই জামালুদ্দীনের সঙ্গেই শাদী দিলেন মেয়ের।

কিন্তু জামাল ছেলেটি বড় তেরিয়া। লাল মিঞার ইচ্ছে ছিল ওকে তিনি ঘরজামাই করবেন। তাঁর নিজের পাঁচ মেয়ে আর এক ছেলের মধ্যে ছেলেটাই সবচেয়ে কমজোরী। প্রায়ই সে কাশির অসুখে ভোগে। কিন্তু জামাল রাজি হলো না, সে তার স্বাধীন ফলের ব্যবসায় ফিরে যেতে চায়। শেষকালে এমন হলো, শ্বশুরে জামাইতে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।

বিয়ের পাঁচ বছর পর জামালুদ্দীন বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ফলের দোকানের আড়ালে সে শুরু করেছিল বন্দুক পিস্তলের চোরা চালানি কারবার। কাছেই বর্ডার, এখানে ঐ সব কারবারের অনেক সুবিধে আছে। বিপদও আছে এই কাজে, কিন্তু এক একজন মানুষ বিপজ্জনক জীবন কাটাতেই চায়। জামালের চওড়া বুক, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, সে এই পৃথিবীতে হেরে যাবার জন্য আসে নি, সে চায় যতটা সম্ভব ভোগ করে নিতে।

জয়বাংলা হবার সময় তার কাজ কারবারে খানিকটা অসুবিধে হলো। বন্দুক-পিস্তলের তখন জলের দাম। একটা মাসকট একশো টাকায় সেধে সেধে বিকোয়, তিনশো টাকায় এল এম জি। কয়েক বছর পর অবস্থা একটু বদলাবার পর সে বেচাকেনা করতে লাগালো পাইপগান। খুব সস্তার মাল হলেও এতে ঝুঁকি কম, এর বাজার সব সময় তেজী থাকে।

কিছু দিনের জন্য সে মাছের ব্যবসাতেও নেমেছিল। কিন্তু এই নিয়ে তার শ্বশুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাধে। গণি খান চৌধুরী লাল মিঞার বিশেষ দোস্ত। লাল মিঞাও কিছুদিন আগে জলকর নিয়েছেন। এখানকার ভেড়িয়াওয়ালারা নিজেদের স্বার্থেই বাংলাদেশ থেকে মাছের স্মাগলিং আটকাতে চায়। নইলে তাদের মাছের দর মেনে যায় যখন তখন। এদের হাতে আছে থানা পুলিশ। জামালুদ্দীন এখানে হেরে গেল।

মাঝে মাঝে ছোটখাটো মারামারিতে জড়িয়ে পড়তো জামালুদ্দীন। তার অসীম সাহস। এইরকম কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামায় সে হঠাৎ প্রাণ হারাতে পারতো,

কিন্তু সে মারা গেল মাত্র সাত দিনের জ্বরে। মাথায় অসহ্য ব্যথা নিয়ে দেখা দিল কী এক নতুন রোগ, আর সেই রোগেই সুস্থ সবল মানুষটি মরে গেল দাপিয়ে দাপিয়ে। এক শীতের রাত্রে। ঘরে তখন তার তিনটে বাচ্চা আর যুবতী স্ত্রী।

জামালুদ্দীনের জমা টাকা পয়সা বা বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিল না। ফলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পথে বসতে হলো হাসিনাকে। তার সোমত্থ যৌবনের জন্যই বাড়িতে শুরু হলো চিল-শকুনের উপদ্রব।

লাল মিঞা বাধ্য হয়েই মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। মেয়েটার কথা মন থেকে তিনি বাদই দিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ মেয়ে যদি হাসনাবাদের বাজারে গিয়ে নাম লেখায়, তাহলে সবাই তো বলবে, দ্যাখো, দ্যাখো লাল মিঞার মেয়ে রেণ্ডি হয়েছে!

লাল মিঞা মেয়ের ঘরে গিয়ে বললেন, বাক্স বিছানা গুছিয়ে নে। আজই যাবি আমার সঙ্গে।

ঘরের মধ্যে কিলবিল করছে তিনটি বাচ্চা। লাল মিঞা ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ঐ শয়তানের বাচ্চাগুলোকে কোথায় নিয়ে যাবি ওদের এখানে রেখে যা!

হাসিনা বাপের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আব্বা, ওদের আমি কোথায় ফেলে যাবো, ওদের আমি নিজের পেটে ধরিচি। ওদের আর কে আছে?

লাল মিঞা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, গিয়াসের নিজের লোক কেউ নেই? তারাই ওদের দেখবে। ওরা আমার কেউ নয়।

হাসিনা বললো, সে মানুষটার তো আপনার জন আর কেউ ছিল না। আছে শুধু এক বুড়ি দাদী, সে চোখে দেখে না ভালো, তার নিজেরই খাবার জোটে না, সে কোথা থেকে ওদের খেতে দেবে?

লাল মিঞা বললেন, তাহলে ওদের রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যা। অমন কত বাচ্চা রাস্তায় থাকে!

ঘরের এক কোণে বসে জুলজুল করে চেয়ে দেখছে তিনটে বাচ্চা। তিন-জনেরই এসব কথা বুঝতে পারার বয়েস হয়ে গেছে।

লাল মিঞা রাগ করে মেয়েকে না নিয়েই ফিরে এলেন। যাক ওরা জাহান্নমে যাক।

খিদের জ্বালা সইতে না পেরে একদিন হাসিনা নিজেই ছেলেমেয়েগুলোর হাত ধরে এসে উপস্থিত হলো বাপের বাড়িতে। তার নিজের মা বেঁচে নেই, কেঁদে পড়লো ছোট আম্মার পায়ের ওপর।

লাল মিঞা প্রথমে এক চোট খুব হম্বিতম্বি করলেন। ও মেয়ের মুখ দর্শনও করতে চাইলেন না। কিন্তু তার ছোটবিবি নাজমা যখন বললেন আহা এয়েছে যখন ফেলে তো দিতে পারবে না! বরং খালপাড়ে যে পাট রাখার ঘরটা বানিয়েছিলে, সেটা তো এখন খালি, সেখানে গিয়ে থাকুক—অমনি লাল মিঞা চটে উঠে এক ধমক দিলেন ছোট বিবিকে। কী তাঁর মেয়ে অতদূরে খাল পাড়ে একা থাকবে? শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে না?

পেয়ারা বাগানের এক কোণে একটা ঘর তুলে দিলেন লাল মিঞা। সে ঘরের অর্ধেকটা গিয়ে পড়লো রহমান সাহেবদের জমিতে। রহমান আপত্তি জানাতেই মামলা ঠুকে দিলেন লাল মিঞা আর সেই মালমার ঝোঁকে বেশ কিছুদিন মশগুল হয়ে রইলেন তিনি।

হাসিনা বাপের বাড়িতে জায়গা পেল একটি শর্তে। সে তার নিজের ভরণ পোষণ পাবে বাপের কাছ থেকে। কিন্তু ছেলেপুলেদের কিছু দেবেন না লাল মিঞা। ওরা তাঁর কেউ নয়, ওরা তাঁর দুশমনের বাচ্চা।

হাসিনা মাঝে মাঝে এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করতে যায়। তখন ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। তিনজন সব সময় থাকে এক সঙ্গে। কী হ্যাংলা, কী হ্যাংলা! যেখানে যা কিছু কুড়িয়ে পায়, সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয় চেটেপুটে। হাসিনা যে-সব বাড়িতে কাজ করতে যায়, সেখানে ওদের যাওয়া নিষেধ। কাজের বাড়িতে তিনটে বাচ্চা ঘুরঘুর করবে, এটা কেউ পছন্দ করে না। তা ছাড়া চোর ছ্যাঁচোড়ের মতন স্বভাব, কখন কোন জিনিসটা টুক করে সরিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

লাইনের ধারে ছেলেমেয়ে তিনটেকে একদিন ভিক্ষে চাইতে দেখে লাল মিঞা প্রবল হুংকার ছাড়লেন। এই বিচ্ছুগুলো তাঁর সুনাম ধ্বংস করতে এসেছে! ওদের বাপ যে-ই হোক, লোকে তো বলবে লাল মিঞার নাতি-নাতনীরা পথে পথে ভিগ্ মেঙ্গে বেড়াচ্ছে।

লাল মিঞা তাঁর বিখ্যাত কান-চাপাটি চড় মারার সুযোগ পেলেন না। তাঁর হুংকার শুনে বাচ্চা তিনটে ইঁদুরের মতন এদিক ওদিক দৌড়ে পালালো। লাল মিঞা বাড়িতে এসে হাসিনার চুলের মুঠি চেপে ধরলেন।

সেই থেকে বাচ্চাগুলোর ভিক্ষে করা বন্ধ। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে লোকের বাড়ির আঁস্তাকুড় খুঁটে খায়। বড় ছেলেটা বেশ চতুর হয়ে উঠেছে। এক একদিন সে বাসের পেছনে চেপে চলে যায় আড়বেলে। সেখান থেকে বেড়াচাঁপার দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে টুকটাক ভিক্ষে করে আসে। এখানে লাল মিঞা দেখতে পাবে না।

তাও গাঁয়ের দু'চারজন লোকের নজরে পড়ে যায়। একদিন হাসিনা বাগানে শুকনো নারকোলের বালদো কুড়োচ্ছে, সেই সময় গিয়াস তাকে বললো, ও হাসিনা, তোর ছেলে জাভেদকে যে দেখলাম বেড়াচাঁপার রাস্তায় ভিক্ষে করছে? লাল মিঞার কানে গেলে যে একেবারে জবাই করে ফেলবে!

বাণবিদ্ধ পাখির মতন হাসিনা ছুটে গিয়ে পড়লো গিয়াসের পায়ের ওপর। ব্যাকুলভাবে বললো, গিয়াস ভাই, বলো না, তুমি আব্বাকে বলো না, আমি ওকে নিষেধ করে দেবো। আর যাবে না!

গিয়াস সস্নেহে তাকে টেনে তুলে বললেন, আরে না না, আমি বলবো না। তুই কি আমার পর? তবে গাঁয়ে কতরকম লোক আছে, কে কখন কথাটা লাল মিঞার কানে তুলে দেবে—তাই তোকে সাবধান করে দিলাম।

সেই সুবাদে গিয়াস হাসিনার বুকে হাত বুলিয়ে নিল ভালো করে। এবং পরদিন কথায় কথায় সেই কথাটা জানিয়ে দিল লাল মিঞাকে। সেবার জাভেদ পার পায় নি, বেধড়ক মার খেয়ে বিছানায় পড়েছিল দু দিন।

লাল মিঞা একদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, তুই আবার নিকে কর, আমার হাতে ভালো পাত্তর আছে।

হাসিনা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ সে রাজি।

লাল মিঞা বললেন, বাজিতপুরের রজব আলির ছেলে শামসের, খুব বুঝদার মানুষ, লরির ব্যবসা করে, অবস্থা ভালো, তার সঙ্গে কথা বলি?

হাসিনা আবার ঘাড় নাড়লো।

—এই অ্যান্ডা-বাচ্চাগুলোর ব্যবস্থা আমি করবো। ওদের আমি পাঠিয়ে দেবো।

—ওরা কোথায় যাবে? ও আব্বা, ওরা তো আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে নে!

—ওরা তোর সঙ্গে যাবে নাকি? তুই পাগল হয়েছিস?

—কেন, বাজিতপুরের সেই মানুষ ওদের নেবেন না?

—কেউ নেয় ? তিনটে গেঁড়ি গেঁড়ি বাচ্চা সমেত কেউ বউ ঘরে আনে ?

—তা হলে ওদের কোথায় ফেলে যাবো ? ওরা যে আমার পেটের সন্তান !

লাল মিঞা এমনভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন তিনি এরকম একটি অদ্ভুত নির্বোধ প্রাণী কখনো দেখেন নি। বাড়িতে বেড়ালের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা বেশী হলে লোকে দূরে পার করে দিয়ে আসে না ? এই বাচ্চা-গুলোকে একদিন শিয়ালদা স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে এলে আর কোনোদিন ওরা এ জায়গা খুঁজে পাবে না। সেখানে ওরা ভিক্ষে করুক আর যাই করুক কেউ তো জানতে যাচ্ছে না।

এই মেয়েকে নিকে করার জন্য অনেকেই রাজি। মেয়ের যৌবন আছে, গুণ আছে। এখনো ও ইচ্ছে করলেই সাধ আহ্লাদ মিটোতে পারে। শুধু ঐ এণ্ডি গেণ্ডিগুলোর জন্যে।

হাসিনা আবার কেঁদে ভাসালো। না, ওদের ছেড়ে সে কোথাও নিকে বসতে পারবে না। তারই পেটের নাড়ি কেটে যে ওদের এ পৃথিবীতে আনা হয়েছে।

উপকারী সামসুল

পাশাপাশি দু'খানি গাঁয়ের জন্য একটা প্রাইমারি স্কুল। সেই স্কুল পেরিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র বারোটি ছেলে বড় স্কুলে পড়তে গেছে। তার মধ্যে বদরুদ্দীন শেখের ছেলে সামসুল হক বি-এ পাস দিয়েছে। ভারী ধীর-স্থির বুদ্ধিমান।

লাইনের ধারে চায়ের দোকানে বসেছিল সামসুল। এমন সময় ধর, ধর, গেল, গেল রব উঠলো একটা। সবাই ছুটে বাইরে এলো। বিকট শব্দে একটা এক্সপ্রেস বাস ব্রেক কষেছে। তার সামনে ভ্যাবাচ্যাক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা মেয়ে। এই বাসটা যদি ওকে চাপা দিয়ে যেত, তবু ড্রাইভারের কোনো দোষ দেওয়া যেত না। শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষায় ড্রাইভারের সমস্ত অনুভূতি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। সে বাস থেকে লাফিয়ে নেমে প্রথমে ঐটুকু মেয়েকেই এক চড় কষালো। পরক্ষণেই সে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলো খুব।

সামসুল জিজ্ঞেস করলো, কার মেয়ে ?

পাশে দাঁড়ানো একজন জবাব দিল, লাল মিঞার নাতনী।

সামসুল বললো, এই সন্ধেবেলা ঐটুকু মেয়ে বড় রাস্তার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

একজন বললে, ওরা তো এইখেনেই থাকে। ঐ দ্যাখো না, ওর দুই ভাইও রয়েছে কাছে।

আর একজন বললো কড়া জান বটে। অন্য কোনো বাচ্চা হলে ঠিকই চাপা পড়তো। কিন্তু হাসিনার ছেলেমেয়েদের কিছুই হয় না। মনে আছে, গত বছর জাভেদকে সাপে কামড়ালো কিন্তু ও ছোঁড়া ঠিক বেঁচে গেল! অ্যাঁ, তোমার আমার ঘরের ছেলেপুলে হলে বাঁচতো? অ্যাঁ?

অন্য দু'জন অকারণে হেসে উঠলো!

সামসুলের মুখে ছড়িয়ে পড়লো একটা পাতলা দুঃখের ছায়া। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। সেই মানুষের জীবনের দামও এত তুচ্ছ হয়! একটা বাচ্চা মেয়ে এইমাত্র মরতে মরতে বেঁচে গেল, আর সেই উপলক্ষে এই লোকেরা হাসছে।

সামসুল একা এগিয়ে গিয়ে বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে সরিয়ে আনলো ভিড় থেকে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, এরকম আর কক্ষনো করো না। বড় রাস্তা দিয়ে এরকম দৌড়োদৌড়ি করতে নেই। তোমার নাম কী খুকী?

মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে কী যে বললো কিছুই বোঝা গেল না।

সামসুল ঘাড় নীচু করে আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী?

এবার মেয়েটি মিনমিন করে বললো, নাহারুন্নেছা।

—চলো, তোমাকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসি।

ওর আর দু'ভাই কাছেই ঘুরঘুর করছিল। তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললো, আসেন না, আমাদের বাড়ি, রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

সন্ধের পর যে-কোনো সম্পন্ন লোকের হাতেই টর্চ থাকে। সামসুলের হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিয়ে জাভেদ আগে আগে দৌড়ালো।

হাসিনার ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে কেরোসিনের কুপি। তাতে আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশী। সেই আলোতেই বসে হাসিনা ব্লাউজ সেলাই করছিল, ব্লাউজটা তার গা থেকে এইমাত্র খুলেছে। পুরুষ মানুষ দেখে তাড়াতাড়ি শাড়ীটা ভালো করে বুকে জড়ালো।

গ্রাম সম্পর্কে পরস্পর মুখ চেনা। সামসুল বললো, তোমার নাম হাসিনা না? তুমি ছেলেমেয়েদের এইভাবে রাস্তায় ছেড়ে দাও কেন?

জাভেদ সোৎসাহে শোনালো দুর্ঘটনা-নাটকটির বিবরণ। ওদের নিস্তরঙ্গ

জীবনে তবু এটা একটা ঘটনা। হাসিনা মেয়েকে কোলে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সামসুলকে বললো, আপনাকে কোথায় বা বসতে দেবো…আমার কপাল পোড়া…আমার ছেলেমেয়েগুলোকে কেউ ভালো বাসে না…

সামসুল মাটির দাওয়ায় বসে শুনলো হাসিনার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী। পেয়ারা বাগানের মাথায় তারকা খচিত আকাশ। পুকুরের জলে খুব জোরে টুপ করে শব্দ হলো। বোধহয় তাল পড়লো একটা।

সামসুল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কবে যে এই সমাজের উন্নতি হবে। এত অবিচার, এত অন্যায় এত কুসংস্কার। তবু কিছু তো চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেককেই।

সে ছোটখাটো একটি বক্তৃতা শোনালো হাসিনাকে। এইভাবে চললে তো তার দুঃখ কোনোদিন ঘুচবে না। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়াও শিখছে না। ওরা বড় হলে কী কাঙালী হবে? একবার সাপের কামড় বা একবার বাস চাপা থেকে বাঁচলেও কি আর বারবার বাঁচবে? বরং ওরা যদি মানুষ হয়, তবে ওরাই একদিন হাসিনার দুঃখ ঘুচবে!

হাসিনা জাভেদকে দেখিয়ে বললো, ওটা দুকেলাস পর্যন্ত পড়েছিল। এখন আর কোথায় বা পড়বে, কেই বা পড়াবে!

সামসুল বললো 'ওটা' বলতে নেই। নিজের ছেলে…বা যে-কোনো মানুষ সম্পর্কেই ওরকম ভাবে কথা বলতে হয় না। আর তুমিই বা এত কম আলোয় সেলাই নিয়ে বসেছিলে কেন? চোখটা যে যাবে। দিনের বেলা সেলাই করতে পারো না?

এরপর মাঝে মাঝেই সামসুল আসতে লাগলো হাসিনার কাছে। সারাদিন সে ব্যস্ত থাকে, সদ্য কাজ পেয়েছে পোস্ট অফিসে, তাই আসে সন্ধের পর। জাভেদের জন্য সে এনেছে বই-খাতা, ছোট মেয়েটির জন্য একটা ফ্রক।

দিন পনেরোও কাটলো না. এর মধ্যেই লাইনের ধারের চায়ের দোকান সরগরম হয়ে উঠলো। একদিন সামসুল সেখানে ঢুকে পড়ে শুনলো, সেদিনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সে নিজে। একজন টিপ্পনী কেটে বললো, ও সামসুল মিঞা, কেমন জমেছে? হাসিনা বিবির চোখে জাদু আছে তাই না? দেখো, যেন তোমার বিবির কানে কথাটা না যায়?

সামসুলের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার নিজের শাদী হয়েছে মাত্র দেড় বছর আগে। কলেজে পড়া মেয়ে। সে কেন একটা গেঁয়ো বিধবার সঙ্গে

অন্যায় কাজ করতে যাবে ?

দু'তিনজন একসঙ্গে বললো, আহা-হা কী কথাই বললে ? নিজের ঘরে বউ থাকলেও বুঝি লোকে অন্য মাগী খোঁজে না ? তা হলে তো দুনিয়াটাই বদলে যেত। দেখো, সাবধান, লাল মিঞা যদি টের পায়, তবে জোর করে নিকে দিয়ে দেবে কিন্তু। তখন ঐ তিনটে বাচ্চা সমেত ঘরে তুলতে হবে হাসিনাকে।

সামসুল তর্ক করলো ঝগড়া করলো, রাগ করে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। কিন্তু পরদিন থেকে সে গুটিয়ে নিল নিজেকে। তাকে নিয়ে সাত নম্বর হলো— যারা নানা কারণে হাসিনাকে সাহায্য করতে গিয়ে পিছিয়ে গেছে আবার।

আমবাগানে

হাসিনা একেবারে পড়ে গেল গণি চৌধুরীর মুখোমুখি। রোজ ভোরবেলা তিনি নিজের বাগান পরিদর্শনে আসেন।

হাসিনার হাতে এক থোকা কাঁচা আম। তাড়াতাড়ি সেটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলে সে চৌধুরী সাহেবের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলো।

গণি চৌধুরীর কিছুই চোখ এড়ায় না। হাসিনা উঠে দাঁড়াবার পর তিনি তার থুতনি ছুঁয়ে বললেন, আহা, ভালো হোক, মঙ্গল হোক। কটা আম নিলি রে ?

হাসিনা ধড়ফড় করে উঠে বললো, ও চাচা আমি গাছ থেকে নিইনি, মাটিতে পড়ে ছেল, বিশ্বাস করেন, ও চাচা—

গণি চৌধুরী সস্নেহে বললেন, আহা তাতে কী হয়েছে, নিয়েছিস নিয়েছিস। বেশ করেছিস।

হাসিনার থুতনিটা তুলে ধরবার সময় তিনি দেখেছেন ওর টলটলে দুটি চোখ। ঠিক যেন গহিন কালো দিঘির জল। তা দেখেই তাঁর মনটা নরম হয়ে গেছে।

তিনি আবার বললেন, দেখি, কটা নিয়েছিস ? ভয় পাচ্ছিস কেন ?

হাসিনা আঁচলের তলা থেকে হাত বার করবার সময় সেই ফাঁকে গণি চৌধুরী দেখতে পেলেন তার বুক। ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারছে। আরও নরম হলো তার মন।

তিনি বললেন, মোটে চারটে ? এ আর এমন কি।

হাসিনা বললো, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু টক রেঁধে দেবো—ওরা বড্ড জ্বালায়, আমি বলে দিয়েছি, খবর্দার চুরি করবি নে, নিতে হয় আমি নিজে আনবো, চাচার ঠেঙে চেয়ে নেবো।

গণি চৌধুরী বললেন, ঠিকই তো, দরকার হলে আমার কাছে আসবি, তোর লজ্জা কী…আরও নিবি ?

শখ করে তিনি গোলাপখাসের কলম লাগিয়ে ছিলেন, এই আম ঠিক কাঁচা অবস্থায় টক রেঁধে খাবার জন্য নয়। তবু তিনি নিজের হাতে সেই ছোট গাছের ডাল থেকে আট দশটা আম ছিঁড়ে নিয়ে বললেন নে, আঁচল পাত।

হাসিনা গা মুচড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। গণি চৌধুরী সুন্দর করে হেসে বললেন, নে, আঁচল পাততে লজ্জা করছিস কেন ?

হাসিনা আঁচল খুলতেই গণি চৌধুরী তার বুকের দিকে চেয়ে থেকে আম-গুলো ঢেলে দিলেন। তারপর হাসিনা যখন পুঁটলি বাঁধতে ব্যস্ত সেই সময় তিনি ওর পিঠে হাত রেখে কাছে আকর্ষণ করে বললেন, কী, খুশী তো ?

হাসিনা উঁ উঁ শব্দ করলো।

গণি চৌধুরীর হাত স্বাধীন হয়ে গিয়ে নড়াচড়া করতে লাগলো যেখানে সেখানে। এর পর আর মাত্র দু'মিনিট লাগলো মাটিতে শুয়ে পড়তে। এত ভোরে কাকপক্ষীও জাগেনি। জাগলেও কেউ আমবাগানের দিকে আসবে না। হাসিনার কোঁচড় থেকে আমগুলো গড়িয়ে গেল, সে অনবরত শব্দ করতে লাগলো উঁ উঁ উ।

ব্যাপারটা শেষ হবার পর গণি চৌধুরীর একই সঙ্গে প্রবল উল্লাস এবং দারুণ ভয়ের অনুভূতি হলো। উল্লাস এই কারণে যে এই বয়সেও তাঁর পৌরুষ অক্ষুণ্ণ আছে। মনে মনে একটা চাপা ভয় ছিলো হয়তো পারবেন না কিন্তু তিনি পেরেছেন। আর ভয় এই জন্য যে, সমাজের একটা গণ্যমান্য লোক হয়ে তিনি এটা কী করে বসলেন ? কথাটা যদি কোনক্রমে লাল মিঞার কানে ওঠে ? লাল মিঞা তাঁর দোস্ত, হাসিনা তাঁর মেয়ের বয়েসী।

ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে এলো অনুশোচনা। হঠাৎ কেন তাঁর মাথা ঘুরে গেল ? বেওয়ারিশ মেয়েমানুষ দেখলেই বুঝি মানুষের মনে এরকম দুষ্টু বুদ্ধি জাগে ? প্রায়ই তিনি হাসিনার কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু সে মনের কথা মনের মধ্যেই ছিল। হঠাৎ এই ভোরবেলা…ছি ছি ছি ছি…যদি তাঁর ছেলেরা একবার শুনতে পায়, মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে সবার সামনে।

একবার তিনি ভাবলেন যা হবার হয়েছে। কী আর করা যাবে! যদি জানাজানি হয়ই, তিনি নিকে করবেন হাসিনাকে এরকম একটা বিবি পেলে তিনি এখনো বিশ বছর বাঁচতে পারবেন হেসে খেলে। কিন্তু হাসিনার যে ঐ তিনটি ছেলেমেয়ে রয়েছে······না, না, সম্ভব না, তাঁর নিজের ছেলেরা কিছুতেই রাজি হবে না, বিষয় সম্পত্তি সব তছনছ হয়ে যাবে। ওরে বাবারে, না না······।

শাড়ী টাঁড়ি সামলে হাসিনা উদাসীন দৃষ্টি মেলে বসে আছে। হাঁটুর ওপরে থুতনি। গণি চৌধুরী তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে বললেন, ও হাসিনা এ কথা কারুকে বলিস না রে, তোর ছেলে মেয়েদের আমি দেখবো, তোকে অনেক জিনিস দেবো, কারুরে বলবি না। কিরে কেটে বল, ও হাসিনা, দেখিস, যদি কেউ শোনে, আমাকে দোজখে যেতে হবে।

গণি চৌধুরী এমন আকুলি বিকুলি করতে লাগলেন যে হাসিনা বলে উঠলো না, চাচা, কাকে কবো একথা? আমার দোষ নেবেন না, আমি বড় হতভাগিনী······

—তোকে আমি দেখবো, হাসিনা, তুই শুধু আমার মান রাখিস, কেউ যেন টের না পায়।

—না, চাচা, কেউ না।

—আমি যাই।

গণি চৌধুরী দ্রুতপদে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

হাসিনা আরও কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলো। কত রকম কথা মনে পড়ছে তার। মনে পড়লো জামালুদ্দীনের কথা। ছেলেমেয়ে তিনটের কথা। হাসিনার কি গুণাহ হলো? গণি চাচা কত বড় একটা মানী লোক, তিনি যখন ইচ্ছে করলেন, হাসিনার মতন সামান্য একটা মেয়ে কি না বলতে পারে? সেটা একটা আস্পর্ধা হয়ে যায় না! আর এ কথা সে কাকেই বা জানাবে, তার কসবী বলে নাম রটে যাবে না?

এইরকম আর একটা ব্যাপার হয়েছিল মাসখানেক আগে। রহমান সাহেবের বন্ধু মীজানুর, যে শহর থেকে আসে। মীজানুর না যেন মজনু। লায়লা-মজনু যাত্রার ঠিক মজনুর মতন চেহারা। সে একদিন দুপুরবেলা চুপে চুপে বলেছিল, এতদিন আমি শাদী করিনি, হাসিনা, এবার তোমাকে দেখে আমার সেই ইচ্ছে জেগেছে। আমার মাকে বলেছি না। মা ঐ বাচ্চাগুলোর জন্য

রাজী হচ্ছেন না। কিন্তু আমি পছন্দ করি তোমার বাচ্চাদের, আমি ওদেরও নিয়ে যাবো, লেখাপড়া শিখবে মাকে যদি রাজী করাতে পারি।

রহমান ভাই নীচতলায় তাঁর স্ত্রীর পাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওপরের ঘরে মীজানুর সাহেব একা। এক গেলাস পানি দিতে এসে হাসিনা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে এই কথা শোনে।

—অত দূরে দাঁড়িয়ে আছো কেন হাসিনা। কাছে এসো, একটু গল্প করি তোমার সঙ্গে।

কী সুন্দর করে কথা বলেন মীজানুর সাহেব। মানুষটা সত্যি ভালো। আজকাল প্রায় ফি-সপ্তাহেই ইনি আসেন রহমান ভাইয়ের সঙ্গে। আজ সকালে হাসিনা নিজে দেখেছে যে বারো শরিকের দিঘি থেকে স্নান করে আসবার পথে মীজানুর সাহেব তার মেয়ে নাহার-এর গাল টিপে আদর করে দিলেন। আহা রে! এ গাঁয়ের কেউ তো হাসিনার ছেলেমেয়েদের ছুঁতেই চায় না, সবাই দূর ছাই করে। মীজানুর সাহেব কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করলেন নাহারকে।

যে-ভাবে সকালবেলা মেয়েকে আদর করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই দুপুরে মাকে আদর করতে শুরু করলেন মীজানুর সাহেব। হাসিনা লজ্জা পেয়ে সরে গিয়েছিল।

মীজানুর বললো, চলে যাচ্ছো কেন হাসিনা? এসো, কাছে এসে বসো! তুমি কী মিষ্টি!

এই কথাটা শুনে ফুড়ুক ফুড়ুক করে হাসি উঠে এসেছিল হাসিনার বুক থেকে। পুরুষ মানুষের মুখে সে অনেক রকম কথা শুনেছে, সে সুন্দর, সে পটের বিবি, সে লক্ষ্মী সোনা, সে দিনকি মোহিনী রাতকি বাঘিনী কিন্তু মিষ্টি? একথা তো কেউ কখনো বলেনি। শহরের লোক এরকমভাবে কথা বলে। মীজানুর সাহেব কত লেখাপড়া জানেন।

মীজানুরের চুমুতে কী সাংঘাতিক উত্তাপ! বাহুতে প্রবল জোর। আনন্দে অবশ হয়ে যেতে যেতেও হাসিনা বলে, আমায় ছেড়ে দিন, কেউ এসে পড়বে—আমায় বকবে, আমার আবার সর্বনাশ হবে।

—কেউ আসবে না।

সেদিনও হাসিনা খুব জোর করে বাধা দিতে পারেনি। মীজানুর সাহেব কত জ্ঞানীগুণী লোক, শহরে বড় চাকরি করেন। শহরে পয়সা ফেললেই কত সিনেমা থিয়েটারের খাপসুরৎ মেয়েদের বগলদাবা করে নিয়ে ঘোরা যায়, সেই

সব ফেলে সেই মানুষটা হাসিনার মতন সামান্য একটি মেয়েকে আদর করতে চাইছেন, সেই সময় বাধা দিতে যাওয়াটা ছোটো মুখে বড়ো কথার মতন হয়ে যায় না? তা ছাড়া মীজানুর সাহেব বারবার বলছিলেন, তুমি ভয় পাচ্ছো কেন হাসিনা, আমি তো তোমাকে বিয়ে করবো, তোমার ছেলেমেয়েদের সুদ্ধু নিয়ে যাবো, মাকে একটু রাজি করাতে পারলেই······

আমবাগানে বসে হাসিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সেটা সুখের না দুঃখের, তা অত বোঝে না হাসিনা।

সে উঠে দাঁড়িয়ে গোলাপখাস কলমের গাছ থেকে আরও কতকগুলো কাঁচ আম পেড়ে ফেললো। যেন এই আমবাগানটা তার নিজের।

পুকুরে চাঁদের ছায়া

ঘরের খুব কাছে শেয়াল ডাকলে হাসিনার ঘুম ভেঙে যায়। শেয়াল এমন জীব, ওরা চুপেচাপে কোথাও যাওয়া আসা করতে পারে না। মুর্গী চুরি করার লোভে শেয়ালগুলো গেরস্তবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে, তার মধ্যে নিজেরাই ডেকে ওঠে এক সময়। অমনি কুকুরগুলো তাড়া করে যায়। তারপর কুকুরের ঘেউঘেউ আর শেয়ালের হোক্কা হো মিলে এক বিকট শব্দ-খিচুড়ি তৈরি হয়।

হাসিনা ঘুম ভেঙে উঠে জানলা দিয়ে বলে, হুস্ হুস্!

সেই সময় কোনো কোনোদিন রাত্রে হাসিনা দেখতে পায় সামনের পুকুরটার জলে একটা চাঁদ ভাসছে। ছেলেবেলা থেকে যখনই এরকম দেখেছে হাসিনা, অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এই দৃশ্যটা তাকে চুম্বকের মতন টানে। চারপাশে একেবারে নিঝুম। পুকুর ধারের নারকোল গাছগুলোর পাতায় একটুও সাড় নেই। জোছনার আলোয় পদ্মপাতাগুলোও সাদা সাদা দেখায়। পুকুরের পানি কিন্তু এখন আরও যেন মিশমিশে কালো। তার মধ্যে আপনমনে খেলা করছে একলা একটা চাঁদ।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কেন যেন হাসিনার বুক মুচড়ে আসে। সে সেখানে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদে কিছুক্ষণ।

আবার শুতে আসবার সময় সে ছেলেমেয়েগুলোকে একবার দেখে। মাটিতে কাঁথা পেতে পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা তিনজন। জাভেদ, সিরাজ আর নাহার। গভীর ঘুমের মধ্যেও ওরা চটাপট হাত চালিয়ে মশা মারছে মাঝে মাঝে। ভীষণ মশা। আগের মশারিটা ছিঁড়ে গেছে সেই কবে! কে আর

নতুন মশারি দেবে ?

বাইরের আকাশের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে ওদের মুখে। এখন পৃথিবীর আর কোনো শিশুর মুখের সঙ্গে ওদের মুখের ঘুমের সারল্যের কোন তফাৎ আছে ? এখন কি কেউ দেখে বলবে, ওরা হতভাগ্য ?

সারাদিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসিনার বিশেষ দেখাই হয় না। হাসিনা কাঠ-কুটো কুড়োয়, ঘুঁটে-গুল দেয়, পরের বাড়িতে কাজ করতে যায়। ছেলে-মেয়েরা কুকুর-ছাগলের মতন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। লাল মিঞার মূল বাড়ির দিকে গেলেই ছোট বিবির কাছ থেকে লাথি ঝাঁটা খেতে হয় ওদের। এই তো গত শনিবার বাণপুরের হাটে সিরাজটা একটা ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সেই পাঁচ-ছ মাইল দূরে বাণপুরে হাট, সেখানে ওরা হেঁটে হেঁটে গেছে। হাসিনা এত বারণ করে তবু ওরা কথা শোনে না। সন্ধের পর খিদে পেলে তখন ঠিক বাড়িতে ছুটে আসবে !

সামান্য যা খাবার থাকে, তাই ভাগ করে চেটেপুটে খেয়ে, তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক হাসিনা ঠিক একটি বিড়ালী-মাতার মতন ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলে। সবাই হুটোপুটি করে ঘরের মধ্যে। এমনকি জাভেদটা এখন এত বড় হয়ে গেছে, সেও দস্যিপনা করে মায়ের সঙ্গে। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই।

হাসিনা ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আস্তে আস্তে। তার ইচ্ছে হলো, ছেলেমেয়েগুলোকে ডেকে তুলে আবার খেলা করে এখন। অমন আনন্দ হাসিনা আর কিছুতে পায় না।

হাসিনার শরীরে ভরা নদীর মতন যৌবন, তবু এই ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সে কক্ষনো কোনো নতুন সোয়ামীর বাড়িতে সুখ ভোগ করতে যাবে না।

হাসিনা আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো, সম্মোহিতভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে পুকুরের পানিতে একলা একলা চাঁদের খেলা। ও চাঁদ, তুমি কত সুখী, তোমাকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না !

সুখেন্দুবাবু

নিম্ন আদালতে লাল মিঞার হার হলো। জমির অধিকার তিনি পেলেন না। পেয়ারা বাগানের সবটা তাঁর নয়। অর্থাৎ হাসিনার ঘরটা ভেঙে দিতে হবে।

অবশ্য এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন লাল মিঞা। তিনি লড়বেন, তিনি বড় আদালতে যাবেন। ইতিমধ্যে তিনি দুটি পাল্টা মামলা রুজু করেছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি মেয়ের ওপর চটে গেলেন আবার। মেয়েটা অপয়া, নইলে গত পনেরো বছরের মধ্যে লাল মিঞা কখনো কোনো মামলায় হারেন নি, এই প্রথম তাঁকে হার স্বীকার করতে হলো। এ যে কত বড় অপমান তা মেয়েছেলেরা বুঝবে না। এ তো শুধু দু পাঁচশো টাকার ব্যাপার নয়!

লাল মিঞা হাসিনাকে ডেকে সাফ বলে দিলেন, সে যদি কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পছন্দ করা পাত্রকে নিকে করতে রাজি না হয়, তা হলে তিনি আর ওর খোরাকি জোগাতে পারবেন না। কানাখোঁড়া নয়, রোগাভোগা নয়, বয়েসকালের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে, এমন মেয়ে কেন নিকে বসবে না? এমন মেয়েকে কোনো বাপ সারাজীবন বসে বসে খাওয়ায়, এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে? তা ছাড়া দিনকাল এখন খারাপ।

দিনকাল সত্যিই খারাপ। পাটের দর এ বছর হু হু করে পড়ে গেছে। ভেড়িতে মাছের আকাল। মাজরা পোকা লেগে ধান একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছে। কারুর মুখে এবার হাসি নেই। গ্রামের চাষীদের মধ্যে যে মানুষটি সবচেয়ে হাসিখুশী সেই রহিম চাচার কপালেও এবার তিনটে ভাঁজ পড়েছে। মাঠের যে-কোনো ফসলই রহিম চাচার কাছে সন্তানের মতন, এবারের রুগ্ন জীর্ণ ধানক্ষেত দেখে তিনিও কপালে হাত দিয়ে বসেছেন, হা আল্লা!

যে-সব বাড়িতে একজন দুজন চাকুরে লোক আছে, শুধু তারাই এবার তেমন ধাক্কা খায়নি। চাকরির বাঁধা মাইনেটা তো আছেই। রহমান সাহেবের বাড়িতে প্রতি শনি-রবিবার বন্ধুবান্ধব এলে হাসিনার ডাক পড়তো কাজের জন্য। তখন হাসিনা চাট্টি বেশী করে রঙীন ভাত আর গোস্ত নিয়ে আসতো ছেলে-মেয়েদের জন্য। তা রহমান সাহেবও কয়েক মাস বাড়ি আসছেন না। তার বউয়ের বাচ্চা হয়েছে, সে আছে এখন জয়নগর-মজিলপুরে তার বাপের বাড়িতে। রহমান সাহেব সপ্তাহান্তে সেখানেই যান। ফলে মীজানুরও আর আসে না।

এই শনিবার রহমান সাহেব আবার এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন এক হিন্দু বন্ধু। আবার হাসিনার ডাক পড়লো।

বন্ধুটির নাম সুখেন্দু। ইনি এ অঞ্চলের একজন নামকরা কনট্রাকটার। বহু বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনাশুনো। গণি খান চৌধুরীর সঙ্গে শেয়ারে এ

বছর রহমান সাহেব সুন্দরবন ফেরি সার্ভিস ডেকে নিয়েছেন। অনেক টাকার ঝুঁকি। চাষের জমি বেচে রহমান সাহেব ব্যবসায় নেমেছেন, এ সময় সুখেন্দু-বাবুর মতন লোকদের হাতে রাখা দরকার। হিন্দু বলে সুখেন্দুবাবুর কিছু কিছু অতিরিক্ত সুবিধে আছে। তিনি এস ডি ও-র বৌকে বৌদি কিংবা পুলিশের এস ডি পি ও-র মাকে মাসীমা ডেকে ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলতে পারেন। তাতেই অর্ধেক কাজ ফতে। টাকা-পয়সা ঘুষের চেয়েও এটা অনেক শক্তিশালী কায়দা।

সুখেন্দুবাবুর লম্বা চওড়া চেহারা। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। দেখলে মনে হয় বেশ একটি ভালো মানুষ লম্পট। লোকটি ঠিক তাই। মদ আর মেয়েছেলের দিকে অত্যধিক ঝোঁক। এদিকে খুব কুচক্রীও নয়। লোকের ক্ষতি করার জন্য দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে না। বরং মাতাল অবস্থায় অনেককেই বলে বসে, আরে, সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। তোমার কী কী চাই, আমাকে বলো না!

সুখেন্দুবাবু এসেছে বিরিয়ানি আর বড় গোস্তের কাবাব খাবার জন্য। রহমান সাহেবকে সে অনেকবার বলেছে, বুঝলে ভাই রহমান, এসব রান্না মুসলমানদের মতন আর কেউ পারে না। কলকাতায় গেলেই আমি একবার আমিনিয়ায় ঢুকে যাই। আমাদের বাড়িতে অবশ্য এ সব চলে না, আমার ঠাকুমা বেঁচে, ওরে বাবা, মুর্গী পর্যন্ত চুপি চুপি খেতে হয়।

অবশ্য, বিরিয়ানি আর কাবাবই বড় কথা নয়, সেই সঙ্গে হুইস্কিও এসেছে। সুখেন্দু এত বেশী হুইস্কি সন্ধেবেলার মধ্যেই খেয়ে ফেললো যে, কাবাব-বিরিয়ানি খাওয়ার দিকে তার আর রুচি রইলো না। জিভ এলিয়ে এসেছে, চোখ ঢুলুঢুলু, মুখে ফুরফুরে হাসি।

দুবার হেঁচকি তুলে সুখেন্দুবাবু বললো, আরে, ইয়ে, পানি নেই যে, শুধু শুধু মাল খাবো, একটু পানি আনাও।

রহমান সাহেব বললো, ও জল খাবেন? হাসিনা, এই হাসিনা, এক জগ জল দিয়ে যা তো!

এ গ্রামের বাড়িতে হিন্দু অতিথি বিশেষ আসে না। কখনো দু-একজন কেউ এলে সবাই সচেতন হয়ে যায়, যেন আদর আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি না থাকে। বাচ্চারা কৌতূহলী চোখে তাকায়। বয়স্করা এসে রামায়ণ মহাভারত বিষয়ে তাদের জ্ঞানের কথা জানিয়ে যায় অতিথিদের।

হাসিনা এক জগ পানি নিয়ে এলো। রহমান সাহেব একটু বেশী বেশী জোর দিয়ে বললেন টিউব ওয়েলের জল এনেছিস তো? পুকুরের জল আনিস নি তো!

সুখেন্দুবাবু জড়ানো গলায় বললো, ও ঠিক আছে, দাও না।

রহমান সাহেব হাসিনার হাত ধরে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, সুখেন্দুদা, এই মেয়েটিকে দেখুন, দেখছেন তো? বলুন তো এর বয়েস কত?

সেই পুরোনো খেলা।

সব শুনে সুখেন্দুবাবু হেসে উঠলো হা-হা করে। বললো তাই নাকি? সত্যি, একদম বোঝা যায় না?

দু চোখ থেকে দুটি লকলকে জিভ বার করে সুখেন্দুবাবু হাসিনার যৌবনময় শরীরটা চাটতে লাগলো। নেশার ঝোঁকে একবার ভাবলো হ্যাঁ, একটা সরেস মাল বটে! একে পাওয়া যায় না? কত টাকা লাগবে?

পরক্ষণেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসলো সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেশা কাটাবার চেষ্টা করলো। মনে মনে বললো, ওরে বাবা, মোছলমানের ঘরের মেয়েছেলে, এদিকে নজর দিতে গিয়ে কি শেষে গর্দানটা খোয়াবো? কোথায় কী গোলমাল হয়ে যাবে, তারপর যদি দাঙ্গা ফাঙ্গা বেধে যায়? কাজ নেই বাবা! গণি চৌধুরী বলেছে এই শীতে লখনৌ বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই ভালো, সেখানে গিয়ে যত খুশী বাঈজী ফাইজী, তারা একেবারে খানদান মোছলমান, এখানকার কোনো শালা টেরটিও পাবে না!

সুখেন্দুবাবুকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখে রহমান সাহেব হাসিনাকে খানিকটা রসিকতার ভঙ্গিতে বললেন, মঈজানুরের সঙ্গে তোর বিয়েটা প্রায় ঠিক করে এনেছিলুম, বুঝলি, কিন্তু ও শালা ট্রান্সফার হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের চাকরি তো। ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে একেবারে দার্জিলিং, বুঝলি?

হাসিনা ভাবলো, আহা, মঈজানুর নিকে করুক বা না করুক, তবু তো সে মুখে অন্তত বলেছিল যে সে ছেলেমেয়েগুলোকেও নিয়ে যাবে? কাল থেকে নাহারের খুব জ্বর। হে খোদাতাল্লা, ওকে তুমি বাঁচিয়ে দিও!

রহমান সাহেব বললেন, তোর জন্য আর একটা পাত্র খুঁজছি। মুশকিল তো ঐ বাচ্চাদের নিয়ে?

সুখেন্দুবাবু চোখ তুলে বললো, কী হয়েছে? এর মধ্যে আবার বাচ্চা

এলো কোথা থেকে ?

রহমান সাহেব খানিকটা ইতিহাস বিবৃত করলেন।

অমনি সুখেন্দুবাবুর মধ্যে সব করে দেবো ভাবটা জেগে উঠলো। সে একজন মাতালের পক্ষে যতখানি চিন্তিত হওয়া সম্ভব ততখানি চিন্তিত ভঙ্গি করে বললো, হ্যাঁ, এটা একটা প্রবলেম। তিন তিনটে বাচ্চা সমেত কে আর শাদী করবে ? তবে এক কাজ করা যায় ? যদি তোমরা রাজি থাকো—

—কী ?

—দ্যাখো, দুঃখ কষ্টে থাকার চেয়ে, বাচ্চাগুলোকে যদি অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়া যায়—পুটিয়ার যে রাজবাড়িটা ছিল না, সেটা তো গতবারে গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে, সেখানে একটা অনাথ আশ্রম খুলেছে।

—তাই নাকি ?

—তাই নাকি মানে ? সেখানকার ফার্নিচার সব আমি সাপ্লাই করেছি, আমি জানি না ? আমি বলি কি, সেখানে ওদের ভর্তি করে দাও, খাওয়া দাওয়া পাবে, লেখাপড়া শিখবে।

—সত্যি···টাকা পয়সা লাগবে না ?

—কিসের টাকা পয়সা ? সে সব তো গভর্ণমেন্ট দিচ্ছে।

রহমান সাহেব হাসিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি হাসিনা, এটা কিন্তু ভালো কথা। ভেবে দ্যাখ, ওরা খাওয়াপরা পাবে, লেখাপড়া শিখবে—

হাসিনা চুপ করে রইলো।

রহমান সাহেব আবার বললেন, সুখেন্দুদা, ওদের নেবে সেখানে ?

সুখেন্দুবাবু বললো, কেন নেবে না ? আলবাৎ নেবে ?

রহমান সাহেব একটু ইতস্তত করে বললেন, মানে, সুখেন্দুদা, তোমাকে খোলাখুলি বলছি, সেখানে মুসলমানের ছেলেমেয়েদের নেয় ?

সুখেন্দুবাবু একটা প্রচণ্ড মাতালের হাসি হেসে বললো, আরে অনাথের আবার হিন্দু মুসলমান কী ? অনাথ মানে তো যার কেউ নেই। হে-হে-হে-হে-হে।

রহমান সাহেব কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, না, মানে, বলছিলাম, ওরা তো বেশ বড় হয়ে গেছে, বড় ছেলেটা তো বেশ বড়!

সুখেন্দুবাবু দু হাত তুলে অভয় দানের ভঙ্গিতে বললো, সে সব আমি ম্যানেজ করে দেবো। সব আমি করে দেবো, তোমার কী কী চাই, বলো না ?

সে আর একবার ঘোলাটে চোখে দেখে নিলো হাসিনার লোভনীয় যৌবন। বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে কাটিয়ে দিলে যদি মেয়েটা কৃতজ্ঞতা জানাতে তার কাছে আসে···যদি। একবার···। যাক গে যাক, না এলো না এলো, লখনৌ তো আছেই!

শুধু যাওয়া, শুধু আসা

সুখেন্দুবাবু যথারীতি পরের দিনই এসব কথা একদম ভুলে গেল। কিন্তু যদিও এসব কথা হয়েছিল রহমান সাহেবের বাড়ির দোতলার ঘরে, তবু কী করে যেন কথাটা রটে গেল গ্রামের মধ্যে। হাসিনার ছেলেমেয়ে তিনটির ব্যবস্থা করার একটা উপায় আছে। পুটিয়ার প্রাক্তন রাজবাড়িতে যে একটা অনাথ আশ্রম হয়েছে, সেই খবরই তো অনেকে রাখতো না। সুযোগ যখন একটা এসেছে, তখন তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। বিশেষত খরচাপাতি যখন সব সরকারই দেবে।

কোনো এক রহস্যময় কারণে, এই ব্যাপারে গণি খান চৌধুরীর ছেলেদেরই বেশী উৎসাহ দেখা গেল। হাসিনার ছেলে মেয়ে তিনটে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, এটা ভালো দেখায় না। একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। তারা ঘুরে ঘুরে জনমত সংগ্রহ করলো। সবাই এ ব্যাপারে একমত। এমন কি, লাইনের চায়ের দোকানে সামসুল হক পর্যন্ত স্বীকার করলো যে, হ্যাঁ, এই ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো। লাল মিঞা তো একেবারে খেপে উঠলেন। তিনি আজ পারলে আজই দিয়ে আসেন। এণ্ডেগেণ্ডিগুলো বিদায় হলে তিনি হাসিনার সুন্দর ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করে দেবেন! সবাই মিলে হাসিনাকে এমন বোঝালো যে হাসিনা আর না বলতে পারলো না। বিশেষ করে, পরোপকারী সামসুল হক পর্যন্ত এসে বললো, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে। মানুষ হবে···। এত সব মাথাওয়ালা লোকেরা কি আর ভুল কথা বলে?

সুখেন্দুবাবুকে ধরাধরি করায় সে কিছু সাহায্য করলো, বাকি ব্যবস্থা করে ফেললো গণি খান চৌধুরীর চৌকোশ ছেলেরা। ফর্ম ফিলাপ করা-টরা শেষ।

একদিন সকালে হাসিনার তিন ছেলেমেয়েকে ভালো করে নাইয়ে, ভালো করে খাইয়ে, নতুন জামা কাপড় পরিয়ে রওনা করে দেওয়া হলো। সঙ্গে গেল গণি খান চৌধুরীর দুই ছেলে আর গিয়াস। অনাথ আশ্রমের অফিস ঘরে গিয়ে

যখন ওরা কথাবার্তা বলছে, ছেলেমেয়ে তিনটে ভ্যাবাচ্যাকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, সেই সময় হঠাৎ সেখানে আলুথালু চুলে, প্রায় পাগলিনীর বেশে হাজির হলো হাসিনা।

সে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বলতে লাগলো, ওগো বাবু, ওদের ছেড়ে দাও! ওরা অনাথ নয়। আমি ওদের মা। যাদের মা থাকে, তারা কি অনাথ হয়? ওগো বাবু, তোমাদের পায়ে পড়ি, ওরা আমাকে ছেড়ে কখনো থাকে নি, আমি ওদের পেটে ধরেছি।

ছেলেমেয়ে তিনটি ছুটে গিয়ে হাসিনাকে ঘিরে দাঁড়ালো। অনাথ আশ্রমের কাউণ্টারের একজন কেরানী বললো, দিস ইজ কল্‌ড ইউনিভার্সাল মাদারহুড! একটা যদি ক্যামেরা থাকতো—

যাবার সময় বাসে চেপে গিয়েছিল ছেলেমেয়েরা। ফেরার সময় এলো হেঁটে। মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে জাভেদ একটা ফড়িং ধরে ফেললো। হাসিনা বললো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে হারামজাদা!

তার আগেই ফড়িংটা উড়ে পালিয়েছে। শুধু একটা ডানা ছিঁড়ে রয়ে গেছে ছেলেটার হাতে।

সিরাজ একটা ডোবায় নেমে তুলে আনলো এক গোছা শাপলা। ওতে ভাল তরকারি হয়।

দেবদূত

আজ শবে বরাত। রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে খরখরে চোখ মেলে চেয়ে আছে হাসিনা।

আজকের দিনটা তার বড় ভালো কেটেছে। অনেক, অনেকদিন পর এমন একটা চমৎকার দিন।

আজ হাসিনার ডাক পড়েছিল গিয়াসদের বাড়িতে। গিয়াসের দাদীর মতন এমন সুন্দর একটা মানুষ দেখা যায় না। বয়েসের গাছ পাথর নেই। চার কুড়ি তো হবেই, টুসটুসে একটা পাকা ফলের মতন চেহারা। এখনো দেখলে বোঝা যায়, এককালে কত ফর্সা রং আর কী দারুণ রূপসী ছিলেন উনি। অতিশয় ধর্মপ্রাণা মহিলা। ওঁর বাপের বাড়ি হাজারীবাগ। এ গ্রামে একমাত্র উনিই পরিষ্কার উর্দু বলতে পারেন। শবে বরাতের উৎসব ঐ বাড়িতেই সবচেয়ে বেশী জমজমাট।

কাজ কি কম! সকাল থেকে বাড়ির মেয়েরা বসে যায় চাল গুঁড়ো করতে। তারপর সেই চাল গুঁড়ো ছাঁকা হয়। তারও পর সেই চালের আটা মেখে তৈরি হয় রুটি। একখানা দুখানা নয়, শয়ে শয়ে। আজকের পুণ্য দিনটিতে বাড়িতে কোনো প্রার্থী এসে ফিরে যাবে না।

রান্নাঘরে রুটি গড়তে গড়তে ফাঁকে ফাঁকেই হাসিনা উঠে গেছে গিয়াসের দাদীর ঘরে। উনি আজ সারাদিন পবিত্র কোরান পাঠ করলেন। তাঁর শোওয়ার ঘরে মেঝের ওপর ছোট জলচৌকি পেতে বসেছিলেন তার সামনে। এই বয়েসেও কী সরল, উন্নত চেহারা! তিনি লেখাপড়া জানা মহিলা, নিজের হাতে মুক্তোর মতন অক্ষরে কোরানের অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন। পবিত্র গ্রন্থ পাঠের সময় তাঁর সুষমামণ্ডিত মুখখানিতে যেন একটা স্বর্গীয় আভা ফুটে ওঠে। হাসিনা সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে।

এক একবার সে বলে, ও দাদীমা, একটু জোরে জোরে পড়েন না, আমরাও একটু শুনি!

দাদীমা চোখ খুলে শান্ত স্বরে বলেন, শুনবি, আয় বোস।

তিনি পড়ে পড়ে মানে বুঝিয়ে দেন, হাসিনা বিভোর হয়ে শোনে। এক অপূর্ব অনুভূতিতে তার মন ছেয়ে যায়। মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে আর কোনো পাপ নেই, দুঃখ নেই, অশান্তি নেই, আছে শুধু আনন্দ।

রান্নাঘর থেকে ডাক পড়লেই সে ছুটে চলে যায়। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে দাদীমার ঘরে। আগে কখনো সে এত মন দিয়ে কোরান পাঠ শোনে নি। কম বয়েসে মন চঞ্চল ছিল, এখন তো তার বয়েসও তিরিশ পার হয়ে গেল।

গিয়াস মাঝে মাঝে দু-একবার তরল চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। ইঙ্গিত করেছিল একটু গোপনে কাছে আসবার। কিন্তু হাসিনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল সেই ডাক। আজ সে ঠিক করেই রেখেছিল, কোনো পুরুষ মানুষের কাছে ঘেঁষবে না, মিথ্যে কথা বলবে না, আঁচলের তলায় চুরি করে খাবার আনবে না। সে শুদ্ধ, ভক্তিমতী হয়ে দিনটা কাটিয়ে দেবে।

সেইরকমভাবেই দিনটা গেছে। সারা দিন ধরে গরীব দুঃখীদের দান করা হয়েছে খাবার। সন্ধেবেলা কতরকম বাজি ফাটানো হলো গিয়াসদের বাড়ির সামনে। পরবের দিনগুলোতে দাদীমা নিজের তোরঙ্গ থেকে টাকা বার করে দেন। উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে হাসিনার ছেলেমেয়েরা জুল-জুল চোখে দেখছিল বাজি পোড়ানো, আজ আর ওরা কুকুরের মতন তাড়া খায় নি, শেষ অবধি

ওরাও পেয়েছিল একটা করে তারাবাজি।

সন্ধের পর আজ আর হাসিনাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে খাবার আনতে হয় নি, তাকে দেওয়াই হয়েছে প্রায় চল্লিশখানা রুটি আর এক ভাঁড় মাংস। গিয়াসদের বাড়িতে কেউ বড় গোস্ত খায় না, ও বাড়িতে বরাবর খাসির মাংস আসে। সেই মাংসের মধ্যে চাকা চাকা আলু। মাংসের চেয়েও মাংসের ঝোলে ডোবানো আলু খেতে এত ভালোবাসে জাভেদটা!

হাসিনার দু হাত ভর্তি খাবার, আর তার পেছনে পেছনে লাফাতে লাফাতে আসছিল ছেলেমেয়েরা। তাদের আর তর সইছে না, সুলুপ সালুপ শব্দ করছে জিভ দিয়ে।

তখনও চলেছে কাঙালীর দল। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ওরা আসে, লোকের বাড়ি বাড়ি ভিখ মেঙে বেড়ায়। জানে, আজ কোনো বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরবে না। সেরকম তিনজনের একটা ছোট দলকে থামিয়ে হাসিনা গুণে গুণে নখানা রুটি দিয়ে দিল। গিয়াসদের বাড়িতে সারাদিন দান চলেছে, হাসিনা নিজের হাতেও রুটি বিলিয়েছে। কিন্তু সে হলো পরের বাড়িতে পরের জিনিস দেওয়া। তাতে তো হাসিনার নিজের দানের পুণ্য হয় নি। এখন হাসিনা তার নিজের রুটি দান করলো। আহা, খাক, ওরাও খাক।

বড় আনন্দে গেল আজকের দিনটা। ছেলেমেয়েরা তৃপ্তি করে খেয়েছে, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত হুটোপুটি করে এই তো খানিক আগে ঘুমোলো। কিন্তু হাসিনা ঘুমোবে না, সে জেগে থাকবে।

আজকের রাতে আশমান থেকে আল্লার ফেরেস্তা নেমে এসে কপালে লিখন দিয়ে যাবেন। আজ দুনিয়ার কোনো মানুষকে খারাপ ভাবতে নেই, আজ কোনো পাপ চিন্তা করতে নেই। হাসিনা ঘুমোবে না, যদি স্বপ্নের মধ্যেও কোনো পাপ চিন্তা আসে! আর কতদিন এমন দুঃখে দিন কাটবে? এবার যেন একটু সুদিন আসে।

হাসিনা জেগে আছে। সে কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ডানায় ভর দিয়ে বাতাস কেটে নেমে আসছেন দেবদূত। তাঁর জ্যোতির্ময় তাঁর রূপ। কখন তাঁর সময় হবে, কখন তিনি হাসিনার ঘরে আসবেন, শুধু সেই প্রতীক্ষা।

আজ আর পুকুরের পানিতে চাঁদের খেলা দেখতে পাওয়া যাবে না। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রতি বছর শবে বরাতএর রাতেই যেন ঠিক বৃষ্টি পড়ে। তখন পৃথিবী আরও বেশী নিঝঝুম হয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর ঘরের

মধ্যে ছেলেমেয়েদের নিশ্বাসের ভর্‌র ভর্‌র শব্দ।

হঠাৎ এক সময় ঘুলিয়ে উঠলো হাসিনার শরীরটা। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো সাংঘাতিক ভাবে। কয়েকবার এপাশ ওপাশ ফিরেও হাসিনা সামলাতে পারলো না নিজেকে। হুড়োতাড়া করে উঠে ছুটে গিয়ে বাইরের দাওয়ায় বসে বমি করলো অনেকটা। বমির সঙ্গে সঙ্গে হাসিনা কাঁদতে লাগলো খুঁ খুঁ করে।

কিছুদিন ধরেই হাসিনা যে সন্দেহ করছিল অথচ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় নি, শেষ পর্যন্ত সত্যি তাই হলো। হাসিনা এ বমির মর্ম বোঝে। এই জন্যই গত কয়েকদিন ঢিসঢাস করছিল শরীরটা। এর কারণ আর কিছুই না, হাসিনা আবার গর্ভবতী হয়েছে, আবার একটা শত্তুর এসেছে তার পেটে।

পরক্ষণেই সে জিভ কেটে বললো, ছিঃ, এ কথা বলতে নেই! পেটের সন্তান কখনো শত্তুর হতে পারে? ও কথা মনে করাও পাপ। যে আসছে, সে আসুক।

আমার একটি পাপের কাহিনী

মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল একটা পার্টিতে। তখন আমি থাকতাম অ্যারিজোনায়। মন-টন খুব খারাপ—অনেকদিন বাড়ি থেকে চিঠি পাই না। বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ নেই। আমার মনমরা অবস্থা দেখে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের অধ্যাপক রিচার্ডসন আমাকে জোর করে একটা পার্টিতে ধরে নিয়ে গেলেন। সেখানেও ভাল লাগছিল না। চুপচাপ একা বসে ছিলাম!

পার্টি চললো রাত দুটো পর্যন্ত, তারপর আস্তে আস্তে বাড়ি ফেরার পালা। প্রায় পঞ্চাশ-জন নারী-পুরুষ উপস্থিত, প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই একবার না একবার কথা বলা হয়ে গেছে। অনবরত ভদ্রতার হাসি হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যথা হবার অবস্থা। মেয়েরা-ছেলেরা টুইস্ট নেচে-নেচে এখন ক্লান্ত, গেলাসের পর গেলাস শুধু বরফ মেশানো হুইস্কি খেয়ে আমার মাথাটা ভারী ভারী লাগছে —এবার বাড়ি ফেরার পালা।

আমার গাড়ি নেই, সেখান থেকে আট মাইল দূরে আমার অ্যাপার্টমেণ্ট—অত রাত্রে ফেরার অন্য কোনো উপায় নেই। অপেক্ষা করে আছি—অধ্যাপক রিচার্ডসন কখন উঠবেন—তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে ফিরবো। রিচার্ডসনের বয়েস ষাটের কম নয়, কিন্তু ছেলে-ছোকরার মতন তিনিও স্যুট-টাই পরা ছেড়েছেন—প্যাণ্টের ওপর শুধু উলের গেঞ্জি—ছেলে-ছোকরাদের চেয়েও বেশী উৎসাহে হাসছেন, হাসাচ্ছেন—মাঝখানে একবার দু'চক্কর নেচেও নিলেন। উৎসাহ তাঁর কিছুতেই ফুরোয় না।

হাতের গ্লাস খালি, আর এক গ্লাস খাব কিনা মনস্থির করতে পারছি না, বেশী নেশায় যদি লটকে পড়ি—তা হলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে বদনাম হয়ে যাবে—এই সময় রিচার্ডসন এসে বললেন, ফিল লাইক গোয়িং হোম?

তক্ষুনি মনস্থির করে আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ইয়েস্। চলো, এবার বাড়ি যাওয়া যাক। ঘুমের কথা বললুম না, বললুম, কাল সকালে উঠেই একটা পেপার তৈরী করতে হবে। যেন কত লক্ষ্মী ছেলে আমি, পড়া-শুনোয় কি মন আমার। অধ্যাপক হেসে আমার কাঁধ চাপড়ালেন।

রিচার্ডসনের বিরাট থাণ্ডারবার্ড গাড়ি সদ্য স্টার্ট নিয়েছে, হঠাৎ তিনি

বললেন, ওঃ হো—মণিকাকেও তো পৌঁছে দেবো বলেছিলাম ! তুমি যাও তো সরকার, মণিকাকে ডেকে আনো ।

মণিকা ? পার্টিতে তো একটাও বাঙালী মেয়ে দেখিনি । অবাক হয়ে, বললুম, কে মণিকা ? চিনি না তো ?

অধ্যাপক বললেন, এখনো মণিকাকে চেনো নি ? তুমি একটা বুদ্ধুরাম । এই পার্টিতে সেই তো সবচেয়ে মিষ্টি মেয়ে ! দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি ।

অধ্যাপক যাকে ধরে আনলেন, সে মোটেই বাঙালী মেয়ে নয়, ছিপছিপে তরুণী মেম এবং মিষ্টিই বা কোথায়—হিংস্র বনবিড়ালীর মতন রিচার্ডসনের বাহু-বন্ধনে ছটফট করছে—কিছুতেই সে আসবে না । তখন রিচার্ডসন বললেন, না, এবার বাড়ি চলো, বড্ড নেশা হয়ে গেছে তোমার ।

বুঝতে পারলুম, মেয়েটি ইটালিয়ান । কয়েকদিন আগেই একটা ইটালিয়ান সিনেমা দেখেছিলাম, আন্তোনিয়নি'র "রাত্রি"—সেই বইতে উপনায়িকা ছিল মোনিকা ভিট্টি নামে একটি মেয়ে । অনেক ইটালিয়ান মেয়ের নামই বাঙালী-বাঙালী শোনায় ।

রিচার্ডসন জোর করে মেয়েটিকে গাড়ির মধ্যে বসালেন । বললেন—সরকার, এই হচ্ছে মোনিকা, আর মোনিকা, মিট সুনীল ।

মেয়েটি দায়সারা ভাবে আমার দিকে ভালো করে না চেয়েই বললো, 'হ্যালো —' তারপর সেই ছেড়ে-আসা পার্টির দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো !

গাড়ি এসে দাঁড়ালো আমার অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এর সামনে । আমি নামবার আগেই মোনিকা সেখানে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়লো । অধ্যাপক হাত নাড়িয়ে বাই বাই বলে হুস্ করে গাড়ি ছেড়ে দিলেন ।

নির্জন রাস্তায় আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে ! মেয়েটি কাছাকাছি কোথাও থাকে বোধহয় । ভদ্রতা করে আমি বিদায় নেবার জন্য বললুম, গুড নাইট ! মেয়েটিও বললো, গুন্নাইট । আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম । মেয়েটিও সেদিকে এলো । তারপর একই বাড়ির প্রবেশ পথে এসে দু'জনে আবার মুখোমুখি দাঁড়ালুম । আমার ধারণা হলো, মেয়েটা অতিরিক্ত মাতাল হয়ে সব কিছু ভুলে গেছে নিশ্চয়ই ! আজ ঝামেলা বাধাবে দেখছি ! মোনিকা ভুরু কুঁচকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার সঙ্গে আসছো কেন ? লীভ মি অ্যালোন !

আমার রাগ হলো । আমি বললুম, মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি; আমি এই বাড়িতেই থাকি—তুমিই আমার পেছন পেছন আসছো !

মোনিকা এবার হাসলো ! বললো, ইজ ইট সো ? তারপর হাত ব্যাগ থেকে একটা চাবি বার করে বললো, এই দ্যাখো, আমার ঘরের চাবি,নাম্বার এইটি থ্রি। তোমার কত ?

আমার ঘরের নম্বর তিয়াত্তর। ন'তলা বাড়িতে অন্তত নব্বই জন ভাড়াটে— সকলকে চেনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমি এসেছি মাত্র একমাস। আমি বললুম। আমার নম্বর তিয়াত্তর—তার মানে তোমার ঠিক নিচের ঘরটাই আমার। আমি যে প্রায়ই ওপরে ধুপধাপ আওয়াজ শুনি, এখন বুঝলুম, সেটা তোমারই মধুর পায়ের ধ্বনি !

মোনিকা এবার খিলখিল করে হেসে বললো, হ্যাঁ, আমি নাচ প্র্যাকটিস করি।

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো, জিজ্ঞসা করলো, এই, তুমি কোন্ দেশের লোক ? ইজিপ্ট ?

আমি মুচকি হেসে বললুম, না।

—তবে ? জাপান ?

ওঃ, পৃথিবী এবং তার মানুষজন সম্পর্কে কি জ্ঞান ওর ! মজা দেখার জন্য আমি সেবারও বললুম, না।

—বুঝতে পেরেছি, তুমি টার্কিশ।

—উহুঁ।

—তবে, তবে আফরিকান ?

—না ! এবারও হল না !

—এই, বলছো না কেন ? তুমি কে ?

—আমি একজন ইণ্ডিয়ান।

ইণ্ডিয়ান শুনে ও একটু সচকিত হয়ে তাকালো। একটু সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওর মুখে খেলা করে গেল। বুঝতে পারছি, ও আমাকে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ভাবছে।. ফের জিজ্ঞেস করলো, রিয়েলি ? ইউ আর অ্যান ইণ্ডিয়ান ?

—হ্যাঁ, খাঁটি ইণ্ডিয়ান।

এবার মোনিকার চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, বুঝতে পেরেছি, ইউ আর অ্যান ইণ্ডিয়ান ফ্রম ইণ্ডিয়া—

আমি প্রাচীন নাইটদের কুর্নিশের ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে বললুম, সি, সিনোরিটা !

—হাউ ওয়াণ্ডারফুল ইট ইজ টু মীট আ রিয়াল ইণ্ডিয়ান—

—গ্রাৎসি সিনোরিটা !

মোনিকা বললো, এসো, এখানে একটু বসি।

আমরা দু'জনে পর্চে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লুম। মধ্যরাত ঝিমঝিম করছে। চওড়া রাস্তায় ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্না। ওপারে একটা উইলো গাছের মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে একটা করুণ শব্দ হয়—এগুলোকে এইজন্য উইপিং উইলো বলে। আগস্ট মাস—এখন শীতের চিহ্ন নেই।

মোনিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে আমার দেশের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। ইটালির অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে মোনিকা, আমেরিকায় পড়তে এসেছে—পড়াশুনোর চেয়ে হৈ-হুল্লোড়েই বেশি উৎসাহ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও কিছুই জানে না—যাকে বলে কিচ্ছু না—এমন কি গান্ধীজীর নামটাও ওর পেটে আসছে মুখে আসছে না। কোথাও শুনেছে, মনে করতে পারছে না ঠিক। আমার ভারী মজা লাগতে লাগলো। অথচ ইটালি সম্পর্কে আমরা অনেক খবর রাখি!

গল্প করতে করতে রাত তিনটে বাজলো, তখন উঠলুম। লিফটে কোনো চালক নেই, অটোমেটিক। বোতাম টিপে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সাততলা, ওর আটতলা—আমাকেই আগে নামতে হবে—সাততলায় আসতে আমি বললুম, গুড নাইট মোনিকা!

অভ্যেস মতন মোনিকা গালটা এগিয়ে দিল। ওখানে বিদায়-চুম্বন দেবার কথা। ইচ্ছে ছিল ভদ্রতাসূচক একটা ঠোনা মারা চুমুই দেবো গালে—কিন্তু হঠাৎ মাথার গোলমাল হয়ে গেল—যাকে বলে 'প্রগাঢ় চুম্বন'—হঠাৎ তাই একখানা দিয়ে ফেললুম, তারপর বললুম, কাল দেখা হবে তো?

পরের দিন রবিবার। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। আমি পূর্ববঙ্গের ছেলে—বৃষ্টি পড়লেই মনটা একটু উদাস উদাস হয়ে যায়। নিজে রান্না করে খেতে হবে—এই সব বৃষ্টির দিনে আর রাঁধতে ইচ্ছে করে না একটুও। সকালে গুটি চারেক হট ডগ্ সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, চায়ের সঙ্গে খাবার মত—তাতেই পেট অনেকটা ভরে আছে—আজ আর দুপুরে রান্নার ঝামেলায় যাবো না—না হয় এক টিন চিকেন-অনিয়ন সুপ গরম করে নেবো!

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পূবদিকের বড় জানলাটার পাশে হাতে বই নিয়ে বসলুম। রাস্তার ওপারে একটা গ্যাস স্টেশন, দূরে দেখা যায় ক্যাপিটলের চূড়া।

দুপুর একটা নাগাদ দরজায় ধাক্কা। খুলতেই মোনিকা এসে ঢুকলো। তখনো ড্রেসিং গাউন পরা, চুল এলোমেলো, হাতে একটা চিঠি লেখার প্যাড আর কলম, খুব ব্যস্ত ভাব। সারা সকাল বোধহয় বিছানাতেই শুয়ে ছিল। এই কাণ্ড কোনো ইটালিয়ান মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। ড্রেসিং গাউন পরে, কোনো সাজ পোশাক না করে—এক দিনের চেনা কোনো বন্ধুর ঘরে আর কোনো জাতের মেয়ে আসবে না।

ব্যস্তভাবে মোনিকা বললো, এই, তোমার পুরো নামের বানানটা কি? ছানিল? সুনীল? তারপর কি যেন?

আমি হাসতে হাসতে বললুম,—কেন, আমার নাম দিয়ে কি হবে?

—এই দ্যাখো না, মায়ের কাছে চিঠি লিখছি।

গড়গড় করে মোনিকা ইটালিয়ান ভাষায় কি যেন পড়ে গেল! এক বর্ণও বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করলুম, এর মানে কি? ইংরেজিতে বলো।

একটু হকচকিয়ে তাকিয়ে মোনিকা ইংরেজি অনুবাদে বললো, মা, কাল রাত্রে আমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে, তুমি ভাবতে পারো? তুমি কল্পনাই করতে পারবে না! একজন ভারতীয়, সত্যিকারের ভারতবর্ষের লোক—সেই সুদূর বে-অফ বেঙ্গলের পাড়ে থাকে—তার সঙ্গে পরিচয় হলো! শুধু তাই নয়, আমরা এক বাড়িতেই থাকি। ছেলেটি প্যাণ্ট শার্ট পরে, গায়ের রং জলপাই ফলের মতন, ইংরেজিতে কথা বলতে পারে, কথায় কথায় হাসে—

আমি হো-হো করে হাসতে লাগলুম। মোনিকা বললো, এই হাসছো কেন? আমার ইংরেজি ট্রানস্লেশান খারাপ হচ্ছে?

উত্তর দেবো কি? আমি তখনও হাসছি। তারপর বললুম, আমিও আমার মাকে চিঠি লিখবো—মা, মঙ্গলগ্রহের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, যে দুপুর একটাতেও ড্রেসিং গাউন পরে থাকে, বিশ্বসুদ্ধ সবাই ইটালিয়ান ভাষা জানে না শুনে অবাক হয়—

—এই-ই, ভালো হবে না বলছি!

আমার কাছে এসে মোনিকা আমার মুখ চাপা দেয় হাত দিয়ে। আমি ওর হাত সরাবার জন্য ওকে কাতুকুতু দেবার চেষ্টা করি।

একটু বাদে মোনিকা বললো, তুমি সত্যিই ইটালিয়ান ভাষা জানো না, তা হলে তো মুশকিল—আমি বেশীক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না!

আমি বললুম, ইংরেজি সম্পর্কে আমারও সেই দশা! বেশ তো মাঝে মাঝে

তুমি ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলবে, আমি বাংলায় বলবো। ঠিক বুঝে যাবো।

—গুড্! বাংলা? এ-ই, তুমি আমায় বাংলা শেখাবে?

—নিশ্চয়ই!

—এখন একটা সেনটেন্স শেখাও।

আমি তক্ষুনি ওকে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বাক্যটি শিখিয়ে দিলুম। বাক্যটির মানে জেনে নিয়ে তক্ষুনি আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাসতে হাসতে বললো—সুনীল আমি টোমাকে বালোবাশি!—এবার তুমি ইটালিয়ান কোন্ কথাটা আগে শিখতে চাও, বলো?

আমি বললুম, আমি দু'চারটে শব্দ জানি। তা ছাড়া জানি, দু'লাইন কবিতা। শুনবে?

মোনিকাকে চমকিত করে আমি আবৃত্তি করলুম, "Incipit vita nova. Ecce deus fortior me,/qui veniens dominibatur mihi." দান্তের সেই অমর কবিতা! তাঁর জীবনের পরম-রমণী সম্পর্কে কবি যা বলেছিলেন, "আজ থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। আমার চেয়েও শক্তিমান এই দেবতা আমাকে আচ্ছন্ন করলেন।" (মোনিকা তো জানে না, বাঙালী ছেলেরা কত চালু হয়। কাল রাত্রে ওর সঙ্গে পরিচয় হবার পর আজ সকালেই আমি খুঁজে ঐ লাইন দুটো বার করে বাথরুমে বারবার পড়ে মুখস্থ করে রেখেছি! কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, আমার ভুল হয়েছিল। মোনিকাকে মুগ্ধ করার জন্য কোনো রকম চেষ্টা করার দরকার হয় না।

মোনিকা ডাগর চোখ মেলে সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তুমি দান্তের কবিতা পড়েছো? তুমি বুঝি কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসো?

আমি আস্তে আস্তে বললুম, যে কবিতা পড়তে ভালোবাসে না, আমি তাকে সম্পূর্ণ মানুষ বলেই মনে করি না।

—আজ থেকে তা হলে আমরা দু'জনে একসঙ্গে কবিতা পড়বো?

সত্যই মোনিকাকে মুগ্ধ করার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না। সরল নিষ্পাপ ওর আত্মা। যা কিছু নতুন কথা শোনে, তাতেই অবাক বিস্ময় মানে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও কিছুই জানতো না—তাই জানার নেশা ওকে পেয়ে বসে। রোমে কিছু ভারতীয় আছে বটে, কিন্তু মিলান শহর থেকে ২০ মাইল দূরে একটা

ছোট্ট শহরের মেয়ে মোনিকা, সেখানে কখনো কোনো ভারতীয় ও চোখে দেখে নি।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধেবেলা মোনিকা আমার ঘরে আসতে লাগলো, দু'জনে একসঙ্গে বসে গল্প করি, হাসি—খুনসুটি হয়—ক্রমশ আমরা অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লুম। মাঝে মাঝে মোনিকা আমার ঘরে এসে রান্না করে দেয়—দু'জনে একসঙ্গে খাই। প্রথম প্রথম ভারতীয় রান্না সম্পর্কেও ওর ভয় ছিল। আমি যখন ওকে বললুম, আমরা বাঙালীরা ম্যাকারুনি আর পিৎসা খাই না বটে, কিন্তু ভাত খাই, মুসুর ডাল অর্থাৎ লেনটিল সুপ, নানা রকম মাছ—তোমাদের প্রিয় ইল অর্থাৎ বান মাছও খাই, ফুলকপি, বাঁধাকপি এবং মাংসের কোনোরকম রান্নাতেই আপত্তি নেই—অর্থাৎ ইটালিয়ানদের সঙ্গে আমাদের খাওয়ার খুব একটা তফাত নেই—তখন ও আশ্বস্ত হলো।

কোমরে অ্যাপ্রন জড়িয়ে মোনিকা যখন রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনের সামনে দাঁড়াতো, তখন ভারী সুন্দর দেখাতো ওকে। এমনিতে খুব রূপসী নয় মোনিকা—একটু বেশী লম্বাটে, উচ্চতায় প্রায় আমার কাছাকাছি—কিন্তু ভারী ছটফটে। সহজ স্বাভাবিকতার মধ্যে যে সৌন্দর্য—মোনিকা সেই সুন্দরী। কোনোরকম আড়ষ্টতা নেই, কোনো পাপ নেই, অকপট সরল ওর ব্যবহার। ওর সাহচর্যে আমিও সৎ হয়ে উঠতে লাগলুম।

মাঝে মাঝে ওকে এক একটা কথা বলে ফেলে বিপদে পড়ি। একদিন ঠাট্টা করে ওকে বললুম, জানিস্, আমাদের নিমতলার শ্মশানঘাটে একটা পাগলি দেখেছিলুম, তোকে দেখলে আমার তার কথা মনে পড়ে। এর পরই বিপদ—বোঝাও ওকে। প্রথম বোঝাতে হবে নিমতলা কোথায়, তারপর বোঝাতে হবে শ্মশান কি জিনিস—সেখানে মানুষ পোড়ায় কেন? আমাদের দেশে সব পাগলিরাই রাস্তা-ঘাটে খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় কিনা—তারা বৃষ্টির সময় কোথায় শোয়, কি খায়? বেশীক্ষণ ইংরেজী বলতে গেলেই আমার দম আটকে আসে—এসব বোঝাতে তো প্রাণান্ত!

একদিন কথায় কথায় ওকে শরৎচন্দ্রের একটা গল্প শোনাতে গিয়ে বলেছিলুম, জানিস্, আমাদের দেশের মেয়েরা এমন—স্বামী অফিস থেকে ফিরলে বউরা অমনি তার জুতোর ফিতে খুলে দেয়, পাখার হাওয়া করে। মোনিকা শুনে বললো, হাউ নাইস এণ্ড সুইট!

পরদিন আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরেছি, মোনিকা আগে থেকেই আমার

ঘরে বসেছিল, আমি ঢুকতেই হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে বুটজুতোর ফিতে খুলতে গেল। মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বললো, এইরকমভাবে বসে তোমার দেশের মেয়েরা ?

নানা কারণে সেই সময়টায় আমেরিকা আমার ভালো লাগছিল না। সব সময় পালাই মন। এখানে কোনো অভাব নেই, অফুরন্ত মদ, প্রচুর মেয়ের সাহচর্য, অর্থের চিন্তা নেই, কাজকর্মও বিশেষ নেই—তবু ভালো লাগছিল না, তবু কলকাতার ভিড়ের ট্রাম-বাস, রাস্তার কাদা আর চায়ের দোকানের বন্ধু-বান্ধবের জন্য আমার মন কেমন করে। একমাত্র মোনিকার জন্যই কিছুটা ভালো লাগছিল। মোনিকার সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে কি রকমভাবে যেন সময় কেটে যেত অজান্তে।

একদিন একটা পার্টিতে আমি আর মোনিকা দু'জনেই গেছি। খুব হৈ-চৈ আর হুল্লোড়ের পার্টি। মোনিকা নাচতে ভালোবাসে—এর ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচছে। আমি অনবরত হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। এই সময় ডম্ বলে আমার চেনা একটি ছেলে এসে বললো, এ-ই সুনীল। তুমি কি খাচ্ছো স্কচ না বার্বন ? এসো, একটু জামাইকা রাম খেয়ে দ্যাখো! খুব ভালো জিনিস।

একসঙ্গে দু'রকম মদ আমার সহ্য হয় না। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় রাজী হয়ে গেলুম। ডম্ খুব মস্তানি দেখাচ্ছিল—এক একটা রামের গেলাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করছে, আমিও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলুম। একটু বাদেই মাথায় নেশা লেগে গেল। আমি টলতে টলতে মোনিকার সামনে গিয়ে বললুম, এসো মোনিকা, তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। তুমি আর কারুর সঙ্গে নাচবে না।

মোনিকা খিলখিল করে হেসে বললো, ধ্যাৎ। তোমার নেশা হয়ে গেছে। তুমি চুপটি করে বসো!

—না, নেশা হয় নি। আমি নাচবো।

—আবার দুষ্টুমি ? যাও, ওখানে গিয়ে বসো!

—মোনিকা, তুমি আমায় রিফিউজ করছো ?

—কি পাগলামি করছো। বলছি, তুমি ওখানে গিয়ে বসো। যাও—

মাতালের অপমানবোধ বড় সাংঘাতিক। আমার এমন অভিমান হল যেন মনে হতে লাগলো, সমস্ত পৃথিবীই আমাকে অবজ্ঞা করছে! আমার আর বেঁচে থাকার কোনো মূল্যই নেই। আমি মাথা নিচু করে গুম্ হয়ে একটা সোফায় বসে রইলুম। আমার হাত থেকে বারবার সিগারেট খসে পড়তে লাগলো।

বাড়ি ফিরতে হলো একসঙ্গেই। ফেরার পথে আমি মোনিকার সঙ্গে একটাও কথা বললুম না। লিফ্‌ট এসে থামলো আমার ঘরের তলায়। আমি বিদায় না জানিয়েই বেরুতে যাচ্ছি—মোনিকা বললো. দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঘরে পেঁছে দিয়ে আসছি। আমার তখন মাথা ঘুরছে. আমার তখন হাত নেই, পা নেই. গোটা শরীরটাই নেই. শুধু একটা প্রবল ভারী মাথা—তবু আমি রুক্ষ-ভাবে বললুম, না কোনো দরকার নেই। থ্যাংকস. থ্যাংকস এ লট!

মোনিকা জোর করে আমার বাহুর নিচে ওর হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে এলো। আমি ওকে সুদ্ধু দুলছি, তবু আমার মাথা প্রবল অভিমান ভরে বলছে. ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও. মেয়েদের কেউ কখনো বিশ্বাস করে?

কোনোরকমে অ্যাপার্টমেণ্টের দরজাটা খুলে ঘরে পা দিয়েছি, কিসে একটা হোঁচট লাগতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠলো! আমি সেখানেই পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হলো শেষ রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসলুম। আমি কোথায়? আমি নিজের বিছানাতেই। আমার পা থেকে জুতো খুলে নেওয়া হয়েছে. গায়ে কোট নেই, গলায় টাই নেই—গায়ে কম্বল চাপা দেওয়া—পাশে মোনিকা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। শিশুর মতন প্রশান্ত ঘুম তার মুখে। দরজার কাছে যেখানে আমি পড়ে গিয়েছিলাম—সেখানে অল্প-অল্প বমির দাগ—নিজের মুখে হাত দিলাম. কিছু নেই। মোনিকা আমার জামা-জুতো খুলে দিয়েছে, বমি মুছেছে—তারপর আমার এই হেভি লাশ টেনে এনে বিছানায় শুইয়েছে। অনুশোচনায় ও গ্লানিতে মন ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর মমতাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। মনে হলো. আঃ, এই যে এই পৃথিবীতে আমি শুধু বেঁচে আছি—এটাই কি বিরাট ঘটনা। আমাকে এক বুক কাদার মধ্যে যদি শেকল দিয়ে বেঁধে ক্রীতদাস করেও রাখা হয় তবুও আমি বেঁচে থাকতে চাইবো!

খুব নরমভাবে আমি মোনিকার কপালে হাত বুলোলুম একবার। মোনিকা একটু কেঁপে উঠে ঘুমের ঘোরেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি নুয়ে ওর কপালে একটা চুমু খেলাম। মোনিকা চোখ মেলে তাকালো, বললো, উঃ, বড্ড শীত করছে। আরও দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করতেই এক নিমেষে চলে এলো উষ্ণতা। পাখির বাসার মতন গরম ওর বুক—সেখানে মুখ গুঁজে কাতরভাবে আমি বললুম, মোনিকা, তুমি আমার ওপর রাগ করো নি? আমার কানের কাছে মুখ

এনে মোনিকা বাংলায় বললো—সুনন্দিল, আমি টোমাকে বালোবাসি।

আবার জ্ঞান হারালুম। আমাদের দু'জনের পোশাক ছিটকে পড়লো খাটের বাইরে। চুমু খেতে খেতে আমার জিভ ওর আলজিভ স্পর্শ করতে ছুটে গেল। আমার পিঠে এমন খিমচে ধরলো মোনিকা যে স্পষ্ট টের পেলুম সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। এক ধরনের অসহ্য সুখের যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলুম আমরা দু'জনেই।

ঘুম ভাঙলো বেলা ন'টায়। চোখ মেলেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে, দরজার তলা থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে আমি মুখ আড়াল করলুম। মোনিকা তার আগেই স্নান সেরে নিয়েছে। কিচেনে টুং-টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একটু বাদে মোনিকা আমাকে চা খেতে ডাকলো।

চায়ের টেবিলে দু'জনে নিঃশব্দ। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আমি গাঢ় স্বরে ডাকলুম, মোনিকা—। ও বললো, চুপ, এখন কোনো কথা বলো না।

—আমাকে একটা কথা বলতে দাও।

—না, কিছু বলো না।

—আমাকে বলতেই হবে। শোনো, যা হয়েছে তার জন্য আমি কোনো অনুতাপ করতে চাই না। কিন্তু আমাকে স্বার্থপর, সুবিধাবাদীও তুমি ভেবো না। তুমি যা বলবে, আমি তার সব কিছুই করতে রাজী। এমনকি বিয়েও···

—চুপ, ও কথা বলো না! না!

—কেন?

—বিয়ে কি ঐ ভাবে হয়—কোনো অবস্থার চাপে কিংবা কোনো ঘটনার ফলে? বিয়ে হয় আরও পবিত্র কারণে।

—মণি, তুমি তো জানো—

—তাও হয় না, তুমি আঘাত পেয়ো না—এ নিয়ে আমরা আর কথা বলবো না। এসো, এটা আমরা ভুলে যাই। আমার মায়ের অনেক দিন থেকেই অসুখ—অন্য কোনো ধর্মের লোককে যদি আমি বিয়ে করি—তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তাঁকে আমি আঘাত দিতে পারবো না। মাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। তুমি এ নিয়ে কিছু ভেবো না—দোষ তো আমারই।

রবিবার দিন ভোরবেলা মোনিকা গির্জায় চলে গেল। ইটালিয়ানরা গোঁড়া ক্যাথলিক—মোনিকাদের পরিবারে ধর্মবিশ্বাস খুবই প্রবল। গির্জার প্রধান

পাদ্রীর কাছে মোনিকা তার পাপের কনফেশান দিয়ে এলো এবং এক মাস মদ, সিগারেট ছোঁবে না ও মাছ ছাড়া আর কোনো আমিষ খাবে না ঠিক করলো। কিন্তু সেদিনই রাত্তিরবেলা পাশাপাশি বসে পোল ভেরলেইন এর কবিতা পড়তে পড়তে আমি অন্যমনস্কভাবে যেই মোনিকার কাঁধে হাত রেখেছি, মোনিকা সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো। ঠোঁট দুটো কাঁপছে, অস্ফুটভাবে বললো, আমি পারছি না, আমি পারছি না! তুমি আমায় ভালোবাসবে না?

মোনিকা আমার বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়েও তীব্রতর কোনো শক্তিতে ওর শরীর ফুঁসছে। আমি ঈশ্বর মানি না, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো ঐশী সীমারেখা জানি না—আমার মনে হয়েছিল, জীবনের সেই মুহূর্তের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবার কোনো যুক্তি নেই। আমি মোনিকাকে আলিঙ্গন করে ওর কোমরের কাছে হাত নিতেই তীব্র আবেগে মোনিকা আমার বুকে কামড় বসিয়ে দিল।

তারপরের দিনগুলো কাটতে লাগলো হু-হু করে। দু'জনে দু'জনের মধ্যে ডুবে রইলাম। সেই সময়টায়, আমার লেখাপড়া-টড়াও ডকে উঠে গিয়েছিল। স্থানীয় ভারতীয় ছেলেরাও আমাকে বয়কট করেছিল দুশ্চরিত্র বলে। কিন্তু মোনিকার মধ্যে আমি এমন একটা জিনিস পেয়েছিলুম—। আমি কদাচিৎ বাইরে বেরোই, অন্য লোকের সঙ্গে দেখাই করি না—মোনিকা বাইরের দরকারী কাজগুলো দ্রুত সেরেই আমার ঘরে চলে আসে। আগে ওর আরও অনেক বন্ধু ছিল—এখন আর কারুর সঙ্গে দেখা করে না। আমরা দ'জনেই যেন শৈশবে ফিরে গিয়েছিলুম—যেখানে কোনো অভাববোধ নেই, প্রয়োজনের গুরুভার নেই।

মাসখানেক বাদে এই আচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠতেই হলো। পনেরোদিন পরে মোনিকার পরীক্ষা। আগের সেমেস্টারে ও পরীক্ষা দেয় নি, এবারও পরীক্ষা না দিলে ওর ভিসার সময় বাড়াতে অসুবিধা হবে। আমার তখন পরীক্ষা-ফরীক্ষার বালাই নেই—তবু আমি মোনিকাকে পড়াশুনো করার জন্য জোর করলুম। মোনিকা আমার ঘরে বসেই বইপত্র ছড়িয়ে পড়াশুনো করে—আমি ওকে ছুঁই না, দূর থেকে ওকে দেখি।

আমি এ পর্যন্ত কোনো পাপ করিনি। একটা মেয়ের সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল—বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকতুম—এটাকে আমি পাপ মনে করিনি।

আমার পাপের কাহিনী এর পর থেকে শুরু। একদিন আমি স্নান করছি, বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে মোনিকা বলল, সুনীল, শিগগির খোলো, একটা জরুরী কথা আছে, শিগ্‌গির!

ওর গলার আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি তোয়ালে জড়িয়েই বেরিয়ে এলুম। মোনিকার মুখ ফ্যাকাসে—হাতে একটা ওভারসীজ টেলিগ্রাম। পড়লাম। ওর বাবা পাঠিয়েছে, ওর মায়ের খুব অসুখ।

মোনিকা কাঁপতে কাঁপতে বললো, বুঝতে পারছি না, মা এখনো বেঁচে আছেন কিনা! মাকে আমি আর দেখতে পাবো না—তা কি হয়? তুমি বলো, তা কি হয়? অসম্ভব! আমি আজই যাবো।

মোনিকার মায়ের বারণ ছিল, মোনিকা যেন কখনো প্লেনে না চাপে। প্লেন সম্পর্কে তাঁর দারুণ ভয়। ইউরোপ-আমেরিকায় এখনো এরকম মা আছে! কিন্তু এখন জাহাজে যাবার সময় নেই। মাকে দেখার জন্য মোনিকা দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো—সেদিনই প্লেনে চাপতে চায়! স্টুডেন্ট্‌ কনসেশন পেলেও প্লেনে ভাড়া প্রায় তিনশো ডলার লাগবে। মোনিকার কাছে তখন সব মিলিয়ে দেড়শো ডলার ছিল, আমার নিজের কাছে ছিল বিরাশি ডলার—তার থেকে পঁচাত্তর ডলার ওকে দিয়ে দিলাম, বাকি টাকাটা ওর দুই বান্ধবীর কাছ থেকে ধার করে সেদিন বিকেলেই প্লেনের টিকিট কাটলো। টিকিট পেতে অসুবিধে হলো না।

আমি এয়ারপোর্টে মোনিকাকে তুলে দিতে গেছি। তখনও সময় আছে। মালপত্র জমা দিয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরছি আমরা। সঙ্গে টাকাকড়ির অবস্থা সংকটজনক। ইচ্ছে থাকলেও এয়ারপোর্টের বার-এ গিয়ে বসার উপায় নেই। মেশিন থেকে দুটো কোকোকলার বোতল নিয়েই তৃষ্ণা মিটিয়েছি। মোনিকা আমাকে বললো, গিয়ে যদি দেখি মা একটু ভালো হয়ে গেছেন—তাহলে আমি সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। এবার আমি পরীক্ষা দেবোই।

আমি বললুম, আমার মনে হচ্ছে, তোমার মা ভালো হয়ে উঠেছেন এর মধ্যে।

—আচ্ছা দেখি, ইন্ডিয়ান যোগীর কথা মেলে কিনা।

—ঠিক মিলবে। মিললে তুমি ফিরবে তো?

—নিশ্চয়ই!

—নাকি বাড়িতে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবে?

—ইস্‌! ওরকম কথা বললে সবার সামনেই তোমার গালটা কামড়ে দেবো বলছি!

দাও না, আপত্তি নেই! কে জানে এই শেষবার কিনা—

—আবার ঐ কথা?

একটু বাদেই মাইকে যাত্রীদের নামে ডাক শোনা গেল। যাত্রী-যাত্রিণীরা একে একে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। পাশের এক কাউণ্টারে ইনসিওরেন্স করা হচ্ছে। প্লেনের সাধারণ ইনসিওরেন্স ছাড়াও এখানে যাত্রীরা অতিরিক্ত ইনসিওরেন্স করাতে পারে। খুব সস্তা। এক ডলারে পনেরো হাজার ডলার। মোনিকা বললো, একটা ইনসিওরেন্স নেবো নাকি? কখনো করাই নি আমি। করাবো?

আমি বললুম, কি হবে? শুধু শুধু টাকা নষ্ট!

—মোটে তো এক ডলার!

—এক ডলারই এখন আমাদের কাছে যথেষ্ট দামী।

—তা হোক! তবু একটা করাই।

ও সেই কাউণ্টারে গিয়ে একটা ফর্ম চাইলো। ফর্মের এক জায়গায় নমিনীর নাম লিখতে হয়। দুর্ঘটনা হলে টাকাটা যে পাবে। মোনিকা ঝকঝকে হাসি মুখে বললো, এখানে তোমার নামটা বসাই! টাকা জমা দিয়ে ফর্মের একটা কপি ও আমার হাতে দিয়ে বললো, এই নাও, সাবধানে রেখো। আমি মরলে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। আমি তখনও বিরক্তভাবে ওকে বলেছি, তুমি শুধু শুধু একটা ডলার বাজে খরচ করলে। যত পাগলামি।

এবারে যাত্রীদের প্লেনে উঠতে হবে। মোনিকা দাঁড়িয়েছে লাইনে সবার শেষে। আমি ওর পাশে পাশে গল্প করতে করতে এগোচ্ছি। গেটের ওপাশে আর আমাকে যেতে দেবে না। গেট পেরিয়ে চলে গেল মোনিকা, আমি ওকে রুমাল উড়িয়ে বিদায় দিলুম। হঠাৎ ও আবার এক ছুটে ফিরে এলো। ঐ একগাদা লোকের মধ্যেই আমাকে বিষম অপ্রস্তুত করে আমার ঠোঁটে একটা দ্রুত চুমু দিয়ে বললো—তুমি কিছু ভেবো না, আমি আবার সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থেকো এইক'টা দিন!

টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ইস্, আজকের দিনে বৃষ্টি না পড়লেই ভালো হতো। বৃষ্টির সময় একটা পাতলা কুয়াশায় সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্লেনে জানলার ধারে সীট পেয়েছে মোনিকা, বৃষ্টি না পড়লে আরও কিছুক্ষণ আমি ওর শরীরের অস্পষ্ট আভাস দেখতে পেতুম। কাচের ভেতর দিয়ে ও আমাকে দেখতে পেতো স্পষ্ট। দারুণ তৃষ্ণার্ত মানুষের মতন মোনিকাকে আরও একটু দেখার জন্য ছটফট করছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, সব বাধা ভেঙে ছুটে গিয়ে

প্লেনের মধ্যে উঠে আরেকবার দেখে আসি। মায়ের অসুখ না সারলে আবার কবে ফিরবে মোনিকা তার ঠিক কি! ততদিন আমি থাকবো কিনা কি জানি! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, মোনিকা যদি ফিরতে না পারে—যেমন করেই হোক্, দু' এক মাসের মধ্যে আমি ইটালিতে চলে যাবো।

প্লেন ছাড়ার আগেই বৃষ্টি প্রবল হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো ঝড়। এখানে ঝড় সহজে আসে না, কিন্তু যখন আসে—তখন বড় দুর্দান্ত। তবু সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই প্লেন উড়লো।

রানওয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে হঠাৎ ভেসে উঠলো হাওয়ায়, চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো একটুক্ষণ। আমি সেই দিকে আকুল হয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করতে লাগলো।

ইস্, আজকেই এমন ঝড়-বৃষ্টির। মোনিকার মায়ের অসুখ নিয়ে এমনিতেই তার মন খারাপ, তার ওপর ঝড়-বৃষ্টির জন্য আরও মন খারাপ লাগবে। যদি কোনো দুর্ঘটনা হয়? না, না, কোনো দুর্ঘটনা হবে না—এসব বোয়িং বিমান কয়েক মিনিটের মধ্যেই পঁচিশ-তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যাবে—সেখানে ঝড়-বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই।

দুর্ঘটনা? হঠাৎ অন্য ধরনের একটা অনুভূতি আমার শরীরে শিহরণ খেলিয়ে গেল। মোনিকার বিমান সদ্য দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেছে, আমি তখনও আকাশের দিকে চেয়ে আছি, আমার হাতে সেই ইনসিওরেন্সের কাগজ—হঠাৎ আমার মনে হলো, দুর্ঘটনায় যদি বিমানটা ভেঙে পড়ে—তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমি পনেরো হাজার ডলার অর্থাৎ একলক্ষ বারো হাজার টাকার মালিক হয়ে যাবো। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা!

আমার মুখখানা ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা বোধ করলুম। ছি, ছি, এ আমি কি ভাবছি। মোনিকা, তাকে আমি এত ভালোবাসি—আমি তার মৃত্যু চিন্তা করছি? এমন সরল সুন্দর মোনিকা—কত শ্বেতাঙ্গ প্রেমিককে উপেক্ষা করে আমার মতন একটা সাধারণ ভারতীয়কে সে অমন সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছে—আমার সুখের জন্য, তৃপ্তির জন্য ও করে নি এমন কাজ নেই—আর আমি তার মৃত্যু চাইছি!

কিন্তু বুকের ভেতর থেকে আমার দ্বিতীয় আত্মা বলতে লাগলো, না, না, তুমি তার মৃত্যু চাইছো না। বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে তোমার তো কোনো হাত নেই। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছার ওপর কিছু নির্ভর করে না—কিন্তু ধরো

যদি ঝড়-বৃষ্টিতে বিমানটা ভেঙেই পড়ে—তুমি তো তা আর আটকাতে পারছো না—তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পেয়ে যাবে এক লক্ষ বারো হাজার টাকা—এক লক্ষ বারো হাজার টাকা কতখানি তা বুঝতে পারছো !

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই বাড়ি ফিরে এলুম। সারা ঘরে মোনিকার স্মৃতি। মোনিকার চটিজুতো জোড়া আমার ঘরেই ফেলে গেছে। প্রায় রাত্তিরে চুপি চুপি আমার ঘরে নেমে এসে ও আমার বিছানায় শুতো। ওর শ্লিপিং স্যুটও রাখা আছে আমার এখানে। বালিশে এখনও লেগে আছে ওর কোমল মুখের স্পর্শ। ছড়ানো রয়েছে ওর বইখাতা. চিরুনি, নাইলনের মোজা। মোনিকাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমার বুক মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো। আগেও দু'চারজন মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে এদেশে—কিন্তু মোনিকার মতন এমন আর কারুর প্রতি নিবিড় আকর্ষণ বোধ করিনি।

/ দেয়ালে লাগানো বিশাল আয়না—এই আয়নার সামনে একদিন মোনিকাকে দাঁড় করিয়েছিলুম, একে একে খুলে ফেলেছিলুম ওর সব পোশাক। মোনিকা আপত্তি করে নি। মুখ টিপে-টিপে হাসছিল—ওর লিলিফুলের মতন নরম গাল দুটিতে আমি আলতোভাবে চুমু খেয়েছিলুম, ওর ঠোঁটে জিভ ঠেকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়েছিলুম। পুকুরঘাটে বাংলাদেশের মেয়েরা জল আনতে গিয়ে কলসীর গলা জড়িয়ে যে রকম আনন্দ পায়—সেই রকম শান্তিময় আনন্দ পেয়েছিলুম ওর সরু কোমর জড়িয়ে। ফর্সা উরু দুটিতে স্বর্গের সুষমা,—দুই বুকের সন্ধিস্থলে মুখ গুঁজে বলেছিলাম, মোনিকা, তুমি দেবীর মতন, তুমি সত্যিই দেবী, আমি তোমায় ভালোবাসি—তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। মনে হয়, মোনিকা যেন এখনও সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—সেইরকমভাবেই আমার দিকে চেয়ে হাসছে।

চেয়ারে কতক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলুম মনে নেই। হঠাৎ খেয়াল হলো আমি সেই ইনসিওরেন্সের কাগজখানাই বারবার পড়ছি। পড়ে দেখছি, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই—টাকাটা আমি পাবো কিনা—আইনগত কোনো অসুবিধা হবে কিনা ! কোনই অসুবিধে নেই, সে নিজে হাতে প্রাপক হিসেবে আমার নাম-ঠিকানা লিখে নিচে সই করে গেছে। মৃত্যু প্রমাণিত হলেই কোম্পানি বাড়ি বয়ে এসে আমাকে টাকা দিয়ে যেতে বাধ্য। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা ! উঃ কি নীচ, শয়তান, পাষণ্ড আমি ! সামান্য টাকার জন্য আমি মোনিকার মৃত্যু চাইছি ! স্বর্গ-দুর্লভ ভালোবাসার স্বাদ দিয়েছে মোনিকা আর আমি…

চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে আয়নার কাছে চলে এলাম। আয়নার গায়ে মুখ লাগিয়ে ব্যাকুল ভাবে বললাম, না, না, না—মণি, আমার সোনা, আমার দেবী, আমি তোমাকে ভালোবাসি—শুধু তোমাকেই—পৃথিবীর বিনিময়েও আমি তোমার মৃত্যু চাই না। না—! আমি শুধু তোমাকেই চাই। প্রচণ্ড রাগে ইনসিওরেন্সের কাগজটা আমি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যদি একটা কিছু ঘটেই যায়—তাহলে টাকাটা শুধু শুধু নষ্ট করার কোনো মানে হয় না! এক লক্ষ বারো হাজার টাকা আমি না নিলে ওটা আর কেউ পাবে না। তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেলাম—লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা না করে সাততলা সিঁড়ি হুড়মুড় করে নেমে চলে এলাম রাস্তায়। কাগজটা তখনও পড়ে আছে—একটু জল লেগেছে কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

নিজেকে সত্যিকারের পাপী মনে হয়েছিল আমার। আমি ভারতীয়, আমি ভিখিরীর জাতের লোক—হঠাৎ টাকা পাবার লোভ কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারি না! আমাদের চোখে এখন টাকার তুলনায় প্রেম, মমতা, কৃতজ্ঞতা এসবই তুচ্ছ। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পেলে আমি এই পোড়ার দেশে আর একদিনও থাকবো না। প্রবাসের রুক্ষ জীবন কে চায়? এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পেলে তক্ষুনি আমি দেশের টিকিট কাটবো—প্লেনের না, জাহাজের—ফিরে গিয়ে কলকাতাতেও থাকবো না, চলে যাবো ফ্রেজারগঞ্জে। সেখানে একটা ছোট বাড়ি বানাবো। আমার অনেক দিনের শখ। আর কারুর দাসত্ব করতে হবে না, কারুর কাছে মাথা নোয়াতে হবে না। সেখানে জমি কিনে আমি নোনা মাটিতে ফসল ফলাবো, সমুদ্রে মাছ ধরবো। জল-কাদার মধ্যে পরিশ্রম করবো আমি, জেলে ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যাবো ঝড়-বাদল তুচ্ছ করে। এই সব পরিকল্পনা করতে করতে ভয়ে কেঁপে উঠেছিলাম আমি! হঠাৎ যেন মনে হলো, আমি মোনিকার মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দে খল্‌খল্‌ করে হাসছি।

সেদিন সন্ধেবেলা আমার বন্ধু ডম্‌ আমাকে ডাকতে এলো। বললো—এই সুনীল, চলো, আজ আমাদের একটা সোয়েল পার্টি আছে—মোনিকা কোথায়? নেই? তাই তোমাকে এমন মনমরা দেখছি! চলো, চলো, তুমি একাই চলো—

জোর করে ধরে নিয়ে গেল আমাকে। গোপন নিষিদ্ধ পার্টি। এ পার্টিতে সামাজিক ভদ্রতা নেই, মদ নেই, খাবারও নেই। শুধু মেরুআনা (গাঁজা)

আর এল. এস. ডি'র পার্টি। পুলিস জানতে পারলে যে-কোনো মুহূর্তে এসে ধরে নিয়ে যাবে। সাতটা ছেলে আর ন'টা মেয়ে। মেয়েগুলোরই উন্মত্ততা বেশী। ডম্ প্রস্তাব করলো, আজ সুনীল আমাদের ইয়োগা শেখাবে। আমি যতই বলি যে আমি যোগ, তন্তর-মন্তর কিছু জানিও না, বিশ্বাসও করি না—কিছুতেই ওরা শুনবে না। শেষ পর্যন্ত আমি ওদের পদ্মাসনে ওঁং তৎ সৎ জপ করা শেখাবার চেষ্টা করলুম। মাটিতে বসা অভ্যেস নেই—পা মুড়ে তো বসতে জানেই না, বসতে গেলে উল্টে পড়ে যায়। ঘরময় ছেলেমেয়ের গড়াগড়ি। সে একখানা দৃশ্য বটে!

মনের মধ্যে আমার দারুণ অস্বস্তি সবসময়, তাই আমি ওদের হৈ-চৈতে ঠিক যোগ দিতে পারছিলুম না সেদিন। মন অতি অস্থির থাকলে এল. এস. ডি. খাওয়া উচিত নয়—বলে আমি এড়িয়ে গেলাম। পাইপে খানিকটা মেরুয়ানা ভরে টানতে লাগলাম। তবু মনের অস্বস্তি কাটে না। পকেটে মাত্র সাত ডলার আছে—সপ্তাহ না ফুরালে আর টাকা পাবার আশা নেই। এই সপ্তাহটা এ দিয়েই কোনক্রমে টেনে-টুনে চালাতে হবে। তখন কলকাতায় আমাদের বাড়ির সংসার খরচও আমাকে এখান থেকে চালাতে হয়। আমার নিজেরও রোজগার তখন বেশী নয়। সেদিন বিকেলেই বাবার চিঠি পেয়েছি—আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের গুরুতর অসুখ—স্পেশালিস্ট দেখাতে হবে, বাড়ি ভাড়া তিনমাস বাকি—অর্থাৎ আরও টাকা পাঠাতে হবে।

নেশার ঝোঁকে অনেকেরই অবস্থা বেসামাল। ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ডম্ শুধু টেবিল ল্যাম্পটা জেবলে রেখেছে। দরজা জানলা সব বন্ধ, ধোঁয়ায় গুমট আবহাওয়া, তার মধ্যে অতগুলো সুগঠিত স্বাস্থ্যবান প্রায় নগ্ন নারী-পুরুষ—এক অকল্পনীয় বিস্ময়কর দৃশ্য। দু'চারজন পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে, অনেকেই কিন্তু মুখোমুখি বসে নিস্পৃহের মতন গল্প করে যাচ্ছে। আমি ছিলাম, জানলার কাছে। এই সময়ে ক্যারোলিন বলে একটা মেয়ে আমার কাছে এসো বললো—এ-ই, তুমি একা একা অমন গ্লাম ফেসেড্ হয়ে বসে আছো কেন?

আমি উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। ক্যারোলিনের বিশাল চেহারা, শক্ত উন্নত স্তন, কলাগাছের মতন দুই ঊরু, শিল্পীদের মডেল হয় ক্যারোলিন। কথা নেই বার্তা নেই ক্যারোলিন আমার কোলের ওপর বসে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বললো, হ্যালো সু-ই-টি!

কি যেন হলো আমার, রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে আমি ক্যারোলিনকে নামিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম মোনিকা ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়েকে আমি চাই না। অন্য কোনো মেয়েকে ছোঁয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোনিকার জন্য আমার শিরায় শিরায় ব্যাকুলতা জেগে উঠলো, আর ক্যারোলিনের প্রতি এলো ঘৃণা। ক্যারোলিন অবাক হয়ে বললো, হেই। ইউ আর ক্রস ? কি হয়েছে তোমার ?

আমি বললুম, মাপ করো, আমার ভালো লাগছে না। আই অ্যাম আ ড্রপ আউট টু নাইট !

তক্ষুনি আমি আমার কোট পরে নিলাম এবং সকলের অনুরোধ, মিনতি উপেক্ষা করে বাইরে চলে এলাম ! বাইরের মুক্ত হাওয়ায় সুস্থভাবে নিশ্বাস নিয়ে মনে হলো মোনিকাকে যেন আমি আবার ফিরে পেয়েছি।

পরদিন সকালে রেডিওতে খবর বলা শেষ করার আগে সংক্ষিপ্তভাবে জানালো —সুইজারল্যাণ্ড আর ইটালির সীমান্তে একখানা বিমান ধ্বংস হয়েছে। যাত্রীদের কাউকে উদ্ধার করা যায় নি। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠে যেন দম-আটকে গেল আমার। রান্নাঘর থেকে রেডিওর কাছে ছুটে এলাম। খবর সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। কাঁটা ঘুরিয়ে আমি অন্য স্টেশন ধরার চেষ্টো করলুম। কোথাও আর তখন খবর নেই। হারামজাদারা—ঐ রকম সাংঘাতিক খবর অত সংক্ষেপে বলার কোন মানে হয় ? কোন্ কোম্পানির প্লেন, কোত্থেকে আসছিল, যাত্রীদের নামের তালিকা—আঃ, অসহ্য, অসহ্য, সেই বিকেলবেলা খবরের কাগজ বেরুবে— তাতে যদি থাকে—অ্যালিটালিয়া বিমান কোম্পানির অফিসে ফোন করবো ? মোনিকার পুরো নাম—মোনিকা আর্লিংগেটি—ইনসিওরেন্সের কাগজটা ড্রয়ারে রেখেছিলাম—ঠিক আছে তো ? অন্য বিমানও হতে পারে অবশ্য—কিন্তু কাগজটা সাবধানে, একলক্ষ বারো হাজার টাকা—প্রায় উন্মাদের মতন ছটফট করছিলুম আমি—এক সময় সংবিত ফিরে এলো। নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণায় বিমর্ষ হয়ে পড়লুম। মোনিকা বেঁচে আছে কিনা সে কথা আমি জানতে চাইছি না, আমি জানতে চাই মোনিকা মরে গেছে কিনা। মোনিকা যদি সত্যিই মরে—তবে আমিই তার হত্যাকারী। আমি তো ওর নিরাপদে পোঁছুবার কথা একবারও ভাবিনি, ওর মৃত্যুর কথাই ভেবেছি শুধু।

ঠিক করলুম, আর রেডিও খুলবো না, আর খবরের কাগজ পড়বো না। আমি কিছু জানতে চাই না। আমায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার পরের

কয়েকটা দিন যে নিরন্তর মানসিক যন্ত্রণায় কাটিয়েছি—তা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই! মুহূর্তে মুহূর্তে মোনিকার মুখ মনে পড়ায় আমার বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠেছে, আবার প্রতি মুহূর্তে আমি দরজার কাছে একটা ভারী জুতো পরা পায়ের আওয়াজের প্রতীক্ষা করেছি, পিওনের পায়ের আওয়াজ টেলিগ্রাম নিয়ে আসবে—যে টেলিগ্রামে থাকবে আমার এক লক্ষ বারো হাজার টাকা পাওয়ার খবর!

ছয়দিনের মধ্যে মোনিকার কোনো চিঠি এলো না, ঠিক সাতদিনের মাথায় আমার দরজায় কে যেন বেল টিপলো। টেলিগ্রাম পিওন ভেবে আমি দৌড়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলাম মোনিকা দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি না স্বপ্ন? একটা নীল রঙের রেন কোট পরা, তার থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে, হাতে দুটো চামড়ার ব্যাগ, রক্তিম ঠোঁট ফাঁক করে ঝক্‌ঝকে দাঁতে আলো করে হাসলো মোনিকা।

আমি কঠোর পুরুষ, জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছি, অনেক নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যবহার পেয়েছি ও দিয়েছি, কখনও আমার চোখে জল আসে নি। কিন্তু সেদিন আমার চোখ জ্বালা করে উঠলো, শেষ পর্যন্ত কাঁদিনি কিন্তু ঐ চোখের জল আসার ইঙ্গিতেই আমি বুঝতে পারলুম, আমার পাপের অবসান হয়েছে। আমি আর লোভী নই, আমি আর কিছু চাই না, শুধু মোনিকাকেই চাই। আমি দু'হাত বাড়িয়ে ডাকলুম, মনি,—সত্যি—তুমি—

হাতের ব্যাগ দুটো ঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মোনিকা ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললো, আমি কথা রেখেছি। দ্যাখো আমি ঠিক সাতদিনের মধ্যেই ফিরে এসেছি।

আমি কোনো কথা বলতে পারছিলুম না, ওকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইলুম। ও আবার খুশী খুশী গলায় বললো, তোমার কথাই সত্যি হয়েছে। গিয়ে দেখলুম, মা ভালো হয়ে গেছেন। আমি না গেলেও পারতুম—যাক গে গিয়েছি ভালোই হয়েছে, নিজের চোখে দেখে এলাম—এখন নিশ্চিন্তে পড়াশুনো করতে পারবো! এ-কদিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি—তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা একটুও ভাবোনি! ভাবোনি তো? এ—ই?

আমি তবু চুপ করে রইলুম।

এ-ই, তুমি কথা বলছো না কেন?

—মোনিকা, আমি খুব খারাপ লোক! এই কদিন শুধু ভাবছিলুম, যদি

তোমার কোনো দুর্ঘটনা হয়—

—তুমিও তাই ভাবছিলে!

মোনিকা আমাকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের মতন হাসিমুখে বললো—জানো, আমার মাও শুধু ঐ কথা ভাবছিলেন! মা যখন শুনলেন আমাকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে, তখন থেকেই মা'র কি চিন্তা। আমি প্লেনে আসবো মা ভাবতেই পারেন না? ফেরার সময়েও যখন প্লেনে এলুম মা'র কি কান্নাকাটি, কিছুতেই আসতে দেবেন না। প্রায়ই প্লেন অ্যাকসিডেণ্ট হয়, আমি যদি মরে যাই—শুধু এই কথা। তুমিও দেখছি, আমার মা'র মতনই।

—না, সে রকম নয়। আমি খারাপ লোক, আমি তোমার মৃত্যুর কথা অনবরত ভাবছিলুম, আর—

—জানি, তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো।

—না, আমি তোমাকে ভালোবাসার যোগ্য নই।

—পাগল! তুমি কিছু বোঝো না! শোনো, যে যাকে যত বেশী ভালোবাসে—সে তত বেশী তার বিপদের চিন্তা করে। দ্যাখো না—ছেলে-মেয়েরা যখন বাইরে খেলাধুলো করতে যায়—মা তখন বলেন, দেখিস্, গাড়ি চাপা পড়িস্ না, মারামারি করিস্ না, চোর ডাকাত যেন ধরে না নেয়—শুধুই বিপদের কথা, ভালো কথা কি বলে? ভালোবাসার নিয়মই এই। মা'র মতন তুমিও আমার মৃত্যুর কথাই শুধু ভেবেছো। মা ছাড়া আমাকে আর কেউ এত ভালোবাসেনি—তোমার মতন।

আমি আচ্ছন্ন, অভিভূত মানুষের মতন দাঁড়িয়ে রইলুম। মোনিকা অভিমানী গলায় বললো,—তুমি আমাকে একটুও আদর করোনি তখন থেকে, এসো—

মোনিকা নিজেই এসে আবার আমার বুকে মাথা রাখলো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজলুম ওর পিঠে। আমার দুই হাত ওর পিঠের ওপর রাখা। সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো, এই হাত মোনিকাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

শকুন্তলা

॥ এক ॥

আপনি এখানে কি করে এলেন ?

দরজা খোলা ছিল। সদর থেকে এখানে আসবার জন্যে তিনতিনটে দরজা। সব ক'টাই খোলা।

সব দরজা খোলা ?

হ্যাঁ। কেউ বাধা দিল না। আমি একটু অবাক হয়েছিলুম। আপনার চোর-টোরের ভয়ও নেই ? অবশ্য এরকম আপনাকেই মানায়।

আপনি কে ?

চোর নই। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

এ সময় আমি কারুর সঙ্গে দেখা করি না। আমার এখন কথা বলার সময় নেই।

কথা না-ই বা বললেন। আমি এখানে চুপ করে বসে থাকব। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনাকে দেখব।

হাতে এক তাল কাদামাটি রগড়াতে রগড়াতে শকুন্তলা নিজেই ভাল করে লোকটিকে দেখল। শম্ভুটা মহা ত্যাঁদোড় হয়েছে, সব ক'টা দরজা খোলা রেখে নিশ্চয়ই রাস্তায় কোন ঝিয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে গেছে। অবশ্য সকাল দশটায় হুট করে কোন চোরের ঢুকে পড়ার কথাও না। এ পাড়ায় চোরেরা জানে এ বাড়িতে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না।

লোকটি বেশ লম্বা, এককালে সুপুরুষই ছিল মনে হয়। এখন শরীরে বেশ চর্বি লেগেছে। বড় বড় চুল, চোখের নিচে কালো দাগ, সম্ভবত অসংযমের ছাপ। সিগারেটটা ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে খুব আলতো ভাবে। আর সিগারেট-ধরা আঙুল দুটি যে একটু একটু কাঁপছে, তা শকুন্তলা আগেই লক্ষ্য করেছে। সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি সদ্য পাট-ভাঙা, সেই তুলনায় পায়ের চটি জোড়া বেশ ময়লা ও রবারের। যতদূর আন্দাজ করা যায়, একটি ভদ্র গোছের লম্পট।

শকুন্তলা একটুও বিচলিত হল না, ভয় পেল না। অনধিকারী পুরুষদের কিভাবে শাসন করতে হয় সে জানে। তার বয়েস উনচল্লিশ, সে অর্ধেক পৃথিবীর

জল খেয়ে এসেছে।

পাতলা মতন হাসি ছড়িয়ে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমায় দেখতে এসেছেন মানে? আমি কি বিয়ের যুগ্যি কনে, না বাজারের বেশ্যা?

এমন সহজ ও অনাড়ম্বর আক্রমণে লোকটি প্রথমে একটু চমকে যায়। তারপর সামলে নিয়ে সে-ও হাসে। তারপর বলে, তা নয়। আপনি বিখ্যাত শিল্পী শকুন্তলা সেনগুপ্ত, আমি আপনাকেই দেখতে এসেছি। আমার নাম প্রবীর মজুমদার। নমস্কার।

এই নামে শকুন্তলার চোখের চমক পড়ল না, কোন চেনা সুর বাজল না। তার দু-হাতই কাদামাখা, সুতরাং হাত জোড় করে নমস্কার করারও কোন প্রশ্ন ওঠে না।

শকুন্তলার পরনে একটা চটের আলখাল্লা, সেটা তার কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝোলা। তার তলায় শুধু শায়া আর ব্রা। জল কাদা নিয়ে মূর্তি গড়ার সময় শাড়ি পরলে খুবই অসুবিধে।

কি দরকার চটপট বলে ফেলুন। আমার সময় নেই।

প্রবীর মজুমদার বলল, আমার সময় আছে। আমি অপেক্ষা করব।

বেশী নছল্লা আমি পছন্দ করি না। আমার সঙ্গে আপনার কোন কাজের কথা আছে?

হ্যাঁ আছে। কিন্তু সেটা আমি এখুনি বলব না, পরে বলব।

একটা ন্যাকড়া তুলে শকুন্তলা আঙুলের কাদা মুছে ফেলল ভাল করে। তারপর সে-ও পাশের টুলের ওপর থেকে তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। শকুন্তলা সিগারেট খাওয়া কমাতে চায়, কিন্তু অন্যের সিগারেটের ধোঁয়া নাকে লাগলে তার মন উচাটন হয়। অনেকক্ষণ পর পর সে শম্ভুকে ডাকে, তার হাতে কাদা থাকলে শম্ভুই এসে একটা সিগারেট তার ঠোঁটে গুঁজে দেশলাই জেবলে দেয়।

শকুন্তলা দেশলাই জ্বালবার আগেই প্রবীর মজুমদার এগিয়ে এসে ফট্ করে একটা লাইটার টিপল তার সামনে।

সিগারেট ধরিয়ে প্রথম ধোঁয়া ছাড়বার পর শকুন্তলা বলল ধন্যবাদ।

তারপর বলল, আমাদের বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকান আছে দেখেছেন?

প্রবীর মজুমদার বলল, না, লক্ষ্য করিনি।

দেখলে আরও লক্ষ্য করবেন যে ওখানে প্রায় আট-ন-দশটা ছেলে বসে আছে। ওরা প্রায় সারাদিন ওখানে বসে থাকে, কারণ ওরা বেকার। ওরা আমায় দিদি বলে খুব মানে। ওদের ডেকে যদি আপনাকে এখান থেকে বার করে দিতে বলি, তাহলে সেটা আপনার পক্ষে মোটেই সুখকর হবে না।

আপনি আমাকে বার করে দিতে বলবেন কেন ?

আমার এই সিগারেটটা শেষ হওয়ার মধ্যে যদি আপনি আপনার কথাবার্তা না শেষ করতে পারেন, তাহলে আপনাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে বলব।

কেন ? আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করিনি। এমনি এমনি কি কেউ কারুকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয় ?

আপনি আমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। সেটা বোঝার মতন বুদ্ধি আপনার নেই। আমার সময় নষ্ট করা মানে ক্ষতি করা নয় ? কোন ভদ্রলোক কখনো আগে থেকে না জানিয়ে হুট করে শিল্পীর স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে না।

আপনি সিগারেটটা অত তাড়াতাড়ি টানছেন কেন ? আমাকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

শম্ভু !

এবার বুঝি পাড়ার ছেলেদের ডাকবেন ? কিন্তু ওরা যদি আমায় গলাধাক্কা দিতে না চায় ? উল্টে ওরা যদি আমায় দেখে কিংবা আমার নাম শুনে আমার অটোগ্রাফ চায় ?

এবার শকুন্তলা ছুঁচোলো চোখে প্রবীর মজুমদারকে আর একবার দেখল। 'তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

অটোগ্রাফ ? আপনার ?

হ্যাঁ। অনেকে চায়।

আপনি ফিল্ম অ্যাকটর ? কিংবা আধুনিক গান করেন ?

ও দুটোর কোনটাই না। তবু, কেউ কেউ, দশজন বেকার ছেলের মধ্যে অন্তত দু' তিনজন আমায় চিনতে পারে, আমার কাছে সই চায়।

আপনি যে-ই হন না কেন, এখানে ধ্যাষ্টামো করতে এসেছেন কেন ? যান, ভালো চান তো ফুটুন এখন !

আপনার মুখের ভাষা খুব চমৎকার। বিশেষত মেয়েদের মুখে এরকম ভাষা শুনতে আমার ভাল লাগে।

হাড়কাটায় যান না। আরও অনেক ভাল ভাষা শুনতে পাবেন। আমার কাছে ভাষা মারাতে এসেছে! শম্ভু!

এবার শম্ভু এসে উঁকি মারল। আঠারো-উনিশ বছর বয়েস, কালো ফুল প্যাণ্ট ও সাদা গেঞ্জি পরা, মুখখানা ঘোড়ার মতন লম্বাটে।

চায়ের কাপে সিগারেটটা নিভিয়ে শকুন্তলা কড়া গলায় বলল, সদর দরজা খুলে রেখেছিলি কেন? তোকে হাজার বার বলেছি না, এই সময় আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাই না। এই ভদ্রলোককে নিয়ে যা, বাইরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দে। আর চা করে নিয়ে আয় আমার জন্য।

প্রবীর বলল, আপনি তা হলে খুবই ব্যস্ত। আমি তবে কবে আবার আসব?

শকুন্তলা আবার হাতে একতলা মাটি নিয়ে বললে, আমার সঙ্গে যদি আপনার সত্যি কোন কাজের কথা থাকে, সে জন্য আমি যথেষ্ট সময় দিয়েছি। আপনি যদি কোন অর্ডার দিতে চান, তাহলে আগেই জানিয়ে রাখছি, আমি এখন হেভিলি বুক্‌ড, আগামী তিন বছরের মধ্যে আমি কোন কাজ নিতে পারব না। আরও একটা কথা জানানো দরকার, আপনি যদি আপনার নিজের মূর্তি গড়াতে চান, তা হলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিলেও আমি সে-কাজ নেব না। আপনার মাথাটা খুবই আন্‌-ইণ্টারেস্টিং। বোঁদা-মার্কা। আপনি ইচ্ছে করলে কুমোরটুলিতে যেতে পারেন।

প্রবীর খুব উপভোগ করে হাসল কথাগুলো শুনে।

তারপর বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মুণ্ডুটা যে-কোন স্কাল্পটরের কাছেই খুব আন-ইণ্টারেস্টিং মনে হবে। কিন্তু আপনাকে দিয়ে আমি কোন মূর্তি গড়াতে আসি নি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক দরকারি কথা ছিল, সে-জন্য অনেকক্ষণ সময় লাগবে।

আমি একজন শিল্পী, আমার কাজের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আমি কথা বলতে আগ্রহী নই। বিশেষত একজন অচেনা লোকের সঙ্গে।

আপনার যারা বন্ধু, তারাও অনেকেই নিশ্চয়ই এক সময় আপনার অচেনা ছিল।

আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল তো। শুনুন মশাই, আমার যারা বন্ধু-ফন্ধু, তাদের কোটা একেবারে ফুল। আর আমার কোন নতুন বন্ধু চাই না।

এটা আপনার ভুল ধারণা।

এনাফ ইজ এনাফ! যাস্ট গেট আউট অফ হিয়ার, উইল য়ু!

প্রবীর শকুন্তলার চোখে সরাসরি চোখ রাখল। শকুন্তলা ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতন চেয়ে আছে, একটুও চোখ সরাল না।

প্রবীর বলল, এরকম ভাবে আসা বোধ হয় আমার ভুলই হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি। আমার নামটা মনে রাখবেন, প্রবীর মজুমদার। এরপর আপনার বন্ধুদের কাছে যখন এই ঘটনাটা বলবেন, তখন দেখবেন, অনন্ত দু'একজন ঠিকই চিনতে পারবে আমার নামটা। আপনার বন্ধু অরিন্দম, সে হয়তো খুব রেগেই যাবে আমার নাম শুনে। অরিন্দম আমার সম্পর্কে যা যা বলবে, তা সব যেন বিশ্বাস করবেন না। ওসব রাগের কথা।

শকুন্তলা তার হাতের কাদার তালটা ছুঁড়ে মারল প্রবীরের মুখে। অব্যর্থ টিপ, প্রবীরের একটা চোখ সমেত বাঁ দিকের মুখটা ভরে গেল কাদায়।

শম্ভু হি হি করে হেসে উঠল।

রুমাল দিয়ে শুধু চোখটা পরিষ্কার করল প্রবীর, বাকি কাদা মুছল না। সেও মিটি মিটি হাসছে।

শকুন্তলার রাগ তখনো কমেনি। ফুঁসতে ফুঁসতে সে জিজ্ঞেস করল, অরিন্দম আমার বন্ধু, একথা কে বলেছে আপনাকে?

প্রবীর বলল, এটা কি কোন অজ্ঞাত ঘটনা? কলকাতার অনেকেই জানে। আমাকে অবশ্য অরিন্দম নিজেই বলেছে আপনার সম্পর্কে।

কি বলেছে অরিন্দম?

আপনি ইস্ট বার্লিন গেলেন, সেই সময় অরিন্দমও গেল ওখানে। আপনারা একই হোটেলে ছিলেন।

সো হোয়াট?

এটা কিছুই ব্যাপার নয়। একটা ঘটনা মাত্র।

অরিন্দম এইসব কথা আপনাকে বলেছে, অর্থাৎ অরিন্দমের সঙ্গে আপনার এতটা ঘনিষ্ঠতা আছে?

ঠিক ঘনিষ্ঠতা বলা যায় না। তবে পরিচয় অনেক দিনের।

পা দিয়ে একটা টুল ঠেলে দিল শকুন্তলা। সেটা উল্টে পড়ে গেল।

শকুন্তলা বলল, ওটা তুলে নিয়ে বসুন। আমি এক্ষুণি অরিন্দমের কাছে চেক করছি। দেখতে চাই সত্যি সে আপনাকে চেনে কিনা। আর হোয়েদার ইউ আর আ স্মল টাইম ক্রুক্!

টুলটা তুলে নিয়ে বেশ গ্যাঁট হয়ে বসল প্রবীর।

শম্ভু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি, ওপর থেকে টেলিফোনটা নিয়ে আয়।

শম্ভু ছুটে চলে যেতেই প্রবীর বলল, আপনার মেজাজটা খুব চমৎকার। এর আগে আপনি আর কারো মুখে কাদা ছুঁড়ে মেরেছেন?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে শকুন্তলা বলল, বেরিয়ে বাঁ দিকের বারান্দার কোণে বাথরুম। যান, মুখটা ধুয়ে আসুন।

থাক না। মন্দ কী! আশা করি আমার মুখের বোদা বোদা ভাবটা এবার অনেকটা কেটে গেছে?

আরও বেড়েছে।

এই দুঃখে আমি এক সময় দাড়ি রেখেছিলুম। তাতে অনেকটা ম্যানেজ হয়ে যায়। গত বছর দোলের সময় দাড়ি কেটে ফেললুম।

আমি আপনার জীবন-কাহিনী শোনবার জন্যে আগ্রহী নই।

আজ থেকে ঠিক সাতদিনের মধ্যে দেখা যাবে, আমরা পরস্পরের বিষয়ে অনেক কিছু জানি।

হোয়াট কনসিট্! আপনি খুব ভুল জায়গায় এসেছেন। শকুন্তলা সেনগুপ্তর কাছে সহজে কেউ পাত্তা পায় না।

শম্ভু ওপর থেকে টেলিফোনটা এনে প্লাগে লাগিয়ে দিল। তিনবারের চেষ্টায় নম্বর পাওয়া গেলেও জানা গেল যে অরিন্দম বাড়ি নেই শকুন্তলা তখন চেষ্টা করল অরিন্দমের অফিসে। সেখান থেকেও সে একটু আগেই বেরিয়েছে।

শকুন্তলার মুখের বিরক্তি লক্ষ্য করে প্রবীর বলল, আপনি তাহলে শান্তনুকেও ফোন করতে পারেন। শান্তনু রায় চৌধুরী। সে বোধ হয় এখন বাড়িতে থাকবে।

আপনি শান্তনুকেও চেনেন?

শান্তনু রায় চৌধুরী বিখ্যাত লোক, তাকে চেনা তো আশ্চর্য কিছু নয়। তবে, শান্তনুও আমাকে চেনে অবশ্য।

শান্তনু কলকাতায় নেই, কাল বোম্বে গেছে। আপনি আমার বন্ধুদের মধ্যে আর কাকে কাকে চেনেন?

রণেন রায়, বাদল কর্মকার, প্রীতি হালদার, নন্দগোপাল আইচ—এ রকম অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। আর্টিস্টদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনি, এক সময় ক্যালকাটা পেইণ্টার্স গ্রুপের সঙ্গে খুব আড্ডা দিয়েছি।

উম্, বেশ খবর-টবর রাখা হয় দেখছি। আমার এতসব বন্ধু যদি আপনাকে

চেনে, তাহলে তারা—কি যেন নাম বললেন আপনার, প্রবীর মজুমদার—তাহলে তারা কেউ কোন দিন আমার কাছে আপনার কথা কিছু বলেনি কেন?

এদের মধ্যে কেউ না কেউ, কোন না কোন প্রসঙ্গে যে আমার নাম একাধিকবার বলেছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। আপনি এখন খেয়াল করতে পারছেন না। তাছাড়া আপনি গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছেন যে আমি একটা বাজে লোক।

আপনি আপনার পরিচয় দিচ্ছেন না কেন?

আমার একটা ছোট্টখাট্টো অহংকার আছে। আমার নাম শুনে যদি কেউ চিনতে না পারে, সেখানে আমি নিজের পরিচয় দিই না।

কিন্তু কারুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে…আপনি নিজে থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখন আপনার পরিচয় দেবেন না?

শম্ভু চা নিয়ে এলো এক কাপ।

আর এক কাপ নিয়ে আয়।

শকুন্তলা প্রবীরকে বলল, আপনি এবার মুখটা ধুয়ে আসুন, আপনাকে আমি অধঘণ্টা সময় দেব। আপনি আমার কৌতুহল জাগিয়ে তুলেছেন।

॥ দুই ॥

চায়ে চুমুক দিয়ে শকুন্তলা বলল, এবারে বলুন।

একটা টুলের ওপর বসে একটা পায়ের ওপর অন্য পা তুলে দিয়েছে শকুন্তলা। তার আলখাল্লার তলার দিকটা কাটা, সেই জন্য তার বাঁ পায়ের ডিম পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে, অন্য যে কোন মেয়ে এতে লজ্জা পায়, কিন্তু শকুন্তলার ভ্রূক্ষেপ নেই।

মুখ-টুখ ধুয়ে এসেছে প্রবীর। তার জামায় জল লেগেছে এখানে ওখানে, চুলের খানিকটা অংশও ভিজে।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে প্রবীর বলল, আপনি আমার সিগারেট খাবেন?

শকুন্তলা হাতটা বাড়িয়ে দিল।

পনেরো-ষোলো বয়েস থেকে মাটি-কাদা, প্লাস্টার, পাথর ও ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ করছে শকুন্তলা। ঐ হাতে সে ছেনি-বাটালি ধরেছে। তার গড়া একটা ১৬ ফিট লম্বা অর্জুনের মূর্তি আছে হায়দ্রাবাদে শালারজঙ্গ মিউজিয়ামে।

এ ছাড়া আট-দশ ফিটের মূর্তি তো অনেক। তবু শকুন্তলার হাত মজুরদের মতন শক্ত ফাটা-ফাটা নয়, মেয়েদের হাতের মতনই। গায়ের রং তেমন উজ্জ্বল নয় শকুন্তলার, মাজা মাজা।

অল্প সময়েরই মধ্যে শকুন্তলার হাতখানি ভাল করে দেখল প্রবীর। তারপর মনে মনে বলল, হুঁ, যত কঠিনতা বুঝি এই মেয়েটির মনে। দেখা যাক!

সিগারেট ধরাবার পর শকুন্তলা আবার জিজ্ঞেস করল, কী চুপ করে বসে আছেন যে?

প্রবীর বলল, আমি প্রথম থেকেই আপনাকে এই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে আমি এখানে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার জন্যই এসেছি। আমি আপনার কাজ দেখতে চাই।

আর্টিস্ট অ্যাট ওয়ার্ক? হা-হা-হা-হা! কেন বইতে এরকম পড়েছেন বুঝি। আর্ভিংস্টোনের লেখা সব রগরগে বই-টই!

প্রবীর চুপ করে রইল।

শকুন্তলা আবার বলল, তার ওপর আবার মেয়েছেলে আর্টিস্ট! বাঙালী ব্যাটাছেলেদের কাছে তো ব্যাপারটা আরও মজার, তাই না? কোন বাঙালি মেয়ে স্কাল্পচার করছে, এটা এখানকার পুরুষদের ঠিক বিশ্বাস হয় না! আপনার বুঝি ধারণা, আমি যে-সব মূর্তি-টুর্তি গড়েছি, সে সব আমার পুরুষ অ্যাসিস্ট্যান্টরাই আসলে সব করে আমি শুধু আইডিয়া ফাইডিয়া দিই? কি ঠিক বলিনি?

না, আমার এ রকম ধারণা নয়। তবে, বড় বড় মূর্তি গড়ার কাজে অন্য দু-একজনের সাহায্য নেওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়।

আপনি বলেছিলেন, আমার সঙ্গে আপনার বিশেষ কোন কাজের কথা আছে।

তা তো আছেই। কিন্তু সেটা এক্ষুনি নয়। আপনার সঙ্গে পরিচয় কিছুটা সইয়ে নেবার পরেই।

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের বেশী আর গড়াবে না, ইউ ক্যান বী শিওর অ্যাবাউট দ্যাট!

আপনি সত্যিই খুব ডিফিকাল্ট ধরনের মহিলা!

আমি ডিফিকাল্ট? আপনি কী? আপনি একটা হামবাগ! আমি কয়েক দিন ধরে অত্যন্ত ব্যস্ত, একটা সাবজেক্ট সবেমাত্র শুরু করেছি, এই সময় আপনার মতন একটা উটকো লোক এসে আমার সময় নষ্ট করবার কি অধিকার আছে? আপনি আজ সকালে আমার মুড নষ্ট করে দিলেন, এর পর আর সারাদিন হয়তো আমি কাজ করতেই পারব না।

আপনি আবার রেগে যাচ্ছেন!

আমি রাগব না! এ দেশের বেশীরভাগ মানুষই জানে না, একজন আর্টিস্টের

মুড নষ্ট হয়ে গেলে—

আমি দুঃখিত।

আপনার মত এক হরিদাস পাল দুঃখিত হল বা না হল, তাতে আমার কী আসে যায়। আমার সকালটা তো নষ্ট হল!

প্রবীর ভাবল, এবারে তার চলে যাওয়াই উচিত। এভাবে শকুন্তলার সঙ্গে ভাব করা যাবে না। চক্ষুলজ্জা কিংবা ভদ্রতার একেবারে ধার ধারে না শকুন্তলা। অপরিচিত লোকদের সে সহ্য করে না।

প্রবীর বলল, আবার যেন কাদার তাল ছুঁড়ে মারবেন না। এবারে আমি সত্যিই চলে যাচ্ছি।

কিন্তু প্রবীরকে তক্ষুণি যেতে হল না।

সে উঠে পড়বার আগেই শম্ভু বলে উঠল, দাসবাবু এসেছেন!

তারপরেই হাতে ব্যাগ নিয়ে ঢুকল একটি ফিটফাট চেহারার যুবক। দেখলেই বোঝা যায় জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ।

ঘরে ঢুকে সে প্রবীরকে দেখে যেন থ মেরে গেল। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল নিষ্পলক।

প্রবীর এই যুবকটিকে চেনে না। কোথাও দেখেছে বলেও মনে পড়ল না।

যুবকটি বিগলিতভাবে ব্যাগ সমেত হাত তুলে প্রবীরকে নমস্কার জানিয়ে বলল, ভাল আছেন?

প্রবীর বলল, হ্যাঁ। আপনি ভাল?

আন্দাজেই সে অনেকের সঙ্গে এইরকম ভাবে কথা বলে।

শকুন্তলা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে ওদের দুজনকে। তার সঙ্গে দেখা করতে এসে ঐ ছেলেটি আগে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছে, এটা তার পছন্দ হবার কথা নয়।

যুবক আবার বলল, আপনাকে গত মাসে দেখেছিলুম বইমেলায়···

এবার যুবকটিকে থামিয়ে দিয়ে শকুন্তলা বলল, কী ব্যাপার, রবীন, আমার সঙ্গে তোমার কোন জরুরি কথা আছে?

রবীন এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁ, শকুন্তলাদি, আমাদের হেডঅফিস থেকে একটা টেলেক্স এসেছে, আপনাকে একবার বম্বে যেতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব···

শকুন্তলা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, বম্বে? আমায় যেতে হবে—কেন? আমার

সময় নেই !

রবীন বলল, আমরা টিকিট-ফিকিট কেটে সব ব্যবস্থা করে দেব, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

শকুন্তলা ধমক দিয়ে বলল, বলছি যে আমার সময় হবে না এখন !

রবীন ছেলেটি বেশ হাসিখুশি। শকুন্তলার ধমকে একটুও দমে না গিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, বাঃ, ও কথা বললে চলে, আপনাকে যেতেই হবে যে। আপনার সেই ফিনিক্স পাখির মূর্তিটা—আমাদের বোম্বে অফিসে বসাবার কথা। তার ব্রোঞ্জ কাস্টিং-এ কী যেন ভুল হয়েছে—

দপ্ করে জ্বলে উঠে শকুন্তলা বলল, রায় অ্যাণ্ড রায় থেকে করাতে বলেছিলুম, নিশ্চয়ই সেখান থেকে করায়নি !

রবীন বলল, তা আমি জানি না। এখন কারেকশান করার জন্যে আপনাকেই যেতে হবে। নইলে আপনারই মূর্তি ব্যাঁকাট্যারা হয়ে থাকবে।

প্রবীর খুব মন দিয়ে শুনছে ওদের কথা।

শকুন্তলা প্রবীরের দিকে এক ঝলক জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রবীনকে বলল, চল, ওপরে চল। এসব কথা যার তার সামনে আলোচনা করা যায় না।

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, আমি অপেক্ষা করব, না চলে যাব ?

সে আপনার ইচ্ছে। তবে দয়া করে এখানকার কোন জিনিসে হাত-টাত দেবেন না !

প্রবীর বসেই রইল। তার কোন তাড়া নেই। আজ সারাদিন সে কোন কাজ রাখেনি।

শকুন্তলা নেমে এলো মিনিট কুড়ি বাদে।

রবীন দাস একবার দরজার বাইরে থেকে কৌতূহলী চোখে প্রবীরকে দেখে নিয়ে চলে গেল।

শকুন্তলা আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা হলে আপনি একজন কবি ? তা এ রকম লম্পটের মতন চেহারা করেছেন কেন ?

প্রবীর হাসল।

শকুন্তলা আবার বলল, আমার বাংলা বই-টই বিশেষ পড়া হয়ে ওঠে না। মানে অনেক দিন পড়িনি। জীবনানন্দ দাসের অনেক কবিতা এক সময় আমার মুখস্ত ছিল। যাক গে সে-কথা। আপনি কী ধরনের কবি…প্রগতিশীল না… কি বলে যেন…ডিকাডেন্ট…বাংলায় কী যেন…অবক্ষয়ী। আপনি প্রগতিশীল

না অবক্ষয়ী ?

প্রবীর এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, শিল্পী হিসেবে আপনি এর মধ্যে কোন্‌টা ?

শকুন্তলা বলল, সব শিল্পীই প্রগতিশীল। শিল্পীরা সব সময়ই আর্টকে এবং সেই সঙ্গে সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে।

প্রবীর বলল, কবিদেরও বোধ হয় শিল্পীদের দলে ফেলা যায়।

আপনার একটা কবিতা পড়ে শোনান তো !

একটা কেন, আপনাকে আমার অনেক কবিতা শোনাব কোন এক সময়। তবে এখন নয়। কারণ, আমার কোন বই তো সঙ্গে নেই।

মুখস্থ থাকে না কবিতা ?

প্রবীর হেসে বলল, না।

শকুন্তলা বলল, যা-ই হোক, এখন পরিচয় জানলুম যে আপনি একজন কবি। বেশ নাম-টাম আছে। লোকে আপনাকে দেখলে চিনতে পারে ! এখন বলুন তো, এই অধমের কাছে কবি মশাইয়ের কী দরকার ?

আমি আপনাকে পর পর দু'দিন স্বপ্ন দেখেছি !

স্বপ্ন ? আমাকে ?

হ্যাঁ। কেন দেখলুম বলুন তো ! আপনার নাম আমি জানি, আপনার আঁকা কিছু ছবি আর ভাস্কর্যও আমি দেখেছি, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার তো কখনো আলাপ হয়নি, সুতরাং আপনাকে স্বপ্নে দেখা আশ্চর্য নয় ? তাও পর পর দু'দিন !

ইউ বেটার গো টু আ সিকিয়াট্রিস্ট !

এটা কোন অসুখের লক্ষণ বলছেন ?

স্বপ্নে কী দেখলেন আমাকে ? ন্যাংটো হয়ে আপনার কোলে বসে আছি ?

আপনি এ রকম ভাষা ব্যবহার করছেন কেন, আমাকে চমকে দেবার জন্য ?

ছাড়ুন ! ও সব কবি-টবিদের ন্যাকামি আমার ঢের জানা আছে। স্বপ্ন-ফপ্ন'র কথা বলে আমার মন গলিয়ে দিয়ে তারপর আমার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা। এই তো ! কোন সুবিধে হবে না।

আপনি কি আমায় বুভুক্ষু ভেবেছেন যে প্রেমে পড়ার জন্য যে-কোন ছুতো করে আপনার কাছে ছুটে আসব ?

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ আমি বুভুক্ষু নই ?

তার মানে অন্য অনেক মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে আপনার ভাব আছে। এখন সারা সকাল বসে বসে কি আমি আপনার জীবন-কাহিনী শুনব? দাঁড়ান মশাই, আগে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিই।

ঝট করে দেওয়াল আলমারির পাল্লা খুলে শকুন্তলা একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করল। ছিপি খুলে কাঁচাই চুমুক দিল খানিকটা। তারপর গলার জ্বালাটা খানিকটা সহ্য করার পর সে বলল, এটা কনিয়াক, অনেক কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়, তাই আপনাকে অফার করতে পারছি না। আমি আপনাদের দিশি ব্র্যাণ্ডি খেতে পারি না। একদম স্পিরিটের গন্ধ।

প্রবীর ভাবল, শকুন্তলার অনেক ছবি বা মূর্তিই গ্রামের গরিব-দুঃখী মানুষদের নিয়ে। অথচ ফরাসী ব্র্যাণ্ডি না হলে তার চলে না। এটা এক ধরনের মজার বৈপরীত্য, তার চেয়ে বেশি কিছু না।

আর একবার বোতলটিতে চুমুক দিয়ে শকুন্তলা সেটিকে আলমারিতে ভরে রাখল।

তারপর চোখ কুঁচকে বলল, আপনার জীবন-কাহিনী শোনবার আগে আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলে নিই। একবার দিল্লিতে একটা সেমিনার অ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছিলুম, বছর দু-এক আগে। উঠেছিলুম ইণ্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে। পাশের ঘরটাতেই উঠেছিল একজন···তার নামটা আর বলছি না, আগে থেকে একটু একটু চেনা ছিল। সেই লোকটা জানত যে শুভব্রতর সঙ্গে আমার ডির্ভোস হয়ে গেছে। আন্‌অ্যাটাচ্‌ড মেয়েমানুষ দেখলেই তো পুরুষমানুষদের চোখ চকচক করে ওঠে। পুরুষরা ভাবে এইসব মেয়েদের শরীর যখন তখন ভোগ করা যায়। এই মক্কেলও আমায় দেখে শিকারী বেড়াল হয়ে উঠল। রাত দশটায় আমার ঘরের দরজায় ঠক ঠক। আমি দরজা খুলতেই বলল, ওর খুব একা একা লাগছে, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে চায়। হাতে একটা হুইস্কির বোতল, আমি যদি ওর সঙ্গে ড্রিংকসে একটু সঙ্গ দিই···। ফেয়ার এনাফ। আমি বললুম আসুন। দুজন পরিচিত মানুষ কি একটু আধটু ড্রিংক করতে গল্প করতে পারে না? কিন্তু লোকটা দু-তিন চুমুক দিয়েই শুরু করল পয়িং।

কী শুরু করল?

পয়িং! উঠে এসে আমার ধার ঘেঁষে বসল। তারপর পিঠে হাত রাখল। তারপর কথা বলতে বলতে চাপড় মারতে লাগল আমার উরুতে। আমি দু'বার সরে সরে বসলুম। একবার মুখে বললুম, ও রকম করবেন না। তবু না শুনে

সে আমায় চটকাচটকি করতে চায়। আমার পায়ে শক্ত জুতো ছিল, সেই জুতো সুদ্ধ পা তুলে লোকটার থুতনিতে ঝাড়লুম অ্যাইসান এক লাথি যে ঘুড়ে পড়ে গেল। বিশ্বাস না হয় ঠিকানা দিচ্ছি, গিয়ে দেখে আসুন এখনো তার থুতনিতে কাটা দাগ আছে।

প্রবীর শব্দ করে হেসে উঠে বলল, আপনার এই গল্পে রীতিমতন একটা মর‍্যাল আছে মনে হচ্ছে!

লোকটাকে কেন ওরকমভাবে মেরেছিলুম জানেন? ও আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন মূল্যই দেয় নি। পুরুষমানুষেরা ভাবে, তারা যখন চাইবে, তখন সব মেয়েকেই রাজি হতে হবে।

আপনি যা বলছেন, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সেটা সত্যি, তা আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মেনে নিচ্ছি।

নাউ, শুট।

আমি আপনাকে আমার জীবন-কাহিনী শোনাতে আসিনি, কারণ আমার জীবন বেশ জটিল। কেউ আমাকে কখনো মারেনি, অথচ আমার অনেক রক্তপাত হয়েছে। আমি আপনাকে দু'দিন স্বপ্ন দেখেছি বলেই আপনার সম্পর্কে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। নিশ্চয়ই আমার মনের কোন একটা স্তরে আপনার সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা ছিল, নইলে এরকম স্বপ্ন দেখলুম কেন? সেই জন্যই···আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে, আপনাকে চিনতে এসেছি।

ব্যস, চেনা হয়ে গেছে তো! এবার—

না, কিছুই চেনা হয়নি। স্বপ্নে যে রকম দেখেছিলুম—

কী মুস্কিল, আপনি আমায় স্বপ্নে দেখেছেন, তার জন্য আমি কি করতে পারি? আমি কবিদের ব্যাপার জানি না, তাদের বোধ হয় কবিতা লেখা ছাড়া আর কোন কাজ-কাম করতে হয় না, দখিন হাওয়া খেলেই তাদের পেট ভরে যায়। কিন্তু আমি রীতিমতন খেটে খাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। দিনের বেলায় কারুর সঙ্গে বসে আলাপচারি করার সময় আমার নেই। আপনি ইচ্ছে করলে কোন দিন সন্ধ্যের পর আসতে পারেন, সন্ধ্যের পর আমি কোন কাজ করি না।

প্রবীর কথাটা একটু চিন্তা করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেশ তাই হবে। কিন্তু আপনার কাজের মধ্য দিয়েই আপনাকে চেনার ইচ্ছে ছিল আমার।

শকুন্তলা বলল, অদ্ভুত আবদার!

হ্যাঁ। আমার ইচ্ছেটা একটু অদ্ভুতই বটে।

আমি প্রথমেই যদি আপনাকে তাড়িয়ে দিতুম, তাহলে আপনি কি করতেন ?

কাল আসতুম, পরশু আসতুম, তার পরের দিন আসতুম···আমার যখন জেদ চেপে গেছে—

এরকমভাবে আগে কেউ আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসে নি। বসুন !

॥ তিন ॥

এর পর এক ঘণ্টা আর কেউ কোন কথা বলে নি।

শকুন্তলা তার মূর্তি নির্মাণে একাগ্র হয়েছে। প্রথমে সে মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে। এই মূর্তিটার কাজ দু-এক দিন আগে শুরু হয়েছে, এখনো বোঝবার উপায় নেই কিসের মূর্তি।

একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে প্রবীর। সে বসে আছে একটা টুলে। পিছনে হেলান দেবার উপায় নেই। এই রকম অবস্থার বেশিক্ষণ বসে থাকা বেশ কষ্টকর কিন্তু প্রবীর একবারও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নি।

এর মধ্যে শম্ভু আর একবার চা দিয়ে গেছে।

শকুন্তলার চা শম্ভু তার মুখের কাছে তুলে ধরে। শকুন্তলা অন্যমনস্কভাবে দু-চার চুমুক খেয়েই মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় যে আর দরকার নেই। তার চোখ সব সময় মূর্তির দিকে। এখন যেন পৃথিবীর আর কোন কথাই তার মনে নেই।

সেই রকম ভাবেই কাজ করতে করতে এক সময় শকুন্তলা মূর্তির দিকে চোখ রেখেই বলল, অরিন্দমের সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয় ?

প্রবীর প্রথমে বুঝতেই পারে নি প্রশ্নটা তারই উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়বার শোনার পর সে বলল, বছর সাত-আটেক হবে বোধ হয়।

আপনারা কি একসঙ্গে পড়তেন ?

না।

কোথায় আলাপ হল ?

প্রথম দিন কোথায় আলাপ হল তা ঠিক মনে নেই। তবে, প্রবীরের এক জেঠতুতো দাদা একটা প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন, তিনি আমারও একটা বই ছাপেন···সেই সূত্রেই প্রথম আলাপ হয়েছিল বোধ হয়।

সেটা তো ফর্মাল আলাপ। তাতেই জার্মানির কোন হোটেলে সে আমার

সঙ্গে একসঙ্গে ছিল কি না সেই গল্প করে ?

আপনি কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। আমি কিন্তু আপনাকে ডিস্টার্ব করিনি একবারও।

আপনি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন ? ঠিকঠাক উত্তর দিন। অরিন্দমের সঙ্গে আপনার কতখানি ঘনিষ্ঠতা ?

অরিন্দম মাঝে মধ্যে আসে আমার কাছে। এসে একটা না একটা ছুতোয় ঝগড়া লাগিয়ে দেয়।

তার মানে ? এ আবার কি ধরনের বন্ধুত্ব ?

আপনি কুহুকে চিনতেন ?

কুহু···মানে অরিন্দমের বৌ ?

হ্যাঁ, শী ফেল্ ফর মী। অরিন্দমের ধারণা, আমার জন্যই কুহুর সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ হয়। কুহু কিন্তু আমার সঙ্গে থাকতে আসে নি কিংবা আমার কাছ থেকে কোন প্রশ্রয়ও পায় নি। কুহু এখন—

বাদল রহমানকে বিয়ে করেছে।

হ্যাঁ। সুতরাং আমার দিক থেকে খুব একটা দায়িত্ব ছিল এটা বলা যায় না। কুহু আমাকে একটা উপলক্ষ করেছিল মাত্র। অরিন্দম আর কুহুর বিবাহ বিচ্ছেদে আমার যদি কোন দায়িত্ব থাকে, তবে আপনার সমান দায়িত্ব আছে।

আমার ?

আপনি জার্মানিতে অরিন্দমের সঙ্গে এক হোটেলে ছিলেন, ঐ কথাটা যদি কুহু জানে, তবে তার পক্ষে কি মেনে নেওয়া সহজ ?

এক হোটেলে মানে তো এক ঘরে নয় ? আমরা যে-হোটেলে ছিলুম, সে-হোটেলে তিনশো চব্বিশটি ঘর ছিল।

কিন্তু আপনি আর অরিন্দম এক ঘরেই রাত কাটিয়েছিলেন।

কে বলল আপনাকে ? আপনি···আপনি···

আপনি উত্তেজিত বা রেগে যাচ্ছেন কেন ? এটাই কি সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার নয় ? আপনি আর অরিন্দম পরস্পরকে আগে থেকেই চেনেন, ইচ্ছে করে এক হোটেলে উঠেছেন···

কে বলেছে ইচ্ছে করে ?

অরিন্দমের থুতুনিতে কোন লাথির দাগ নেই। সুতরাং অনুমান করা যায় আপনি তাকে ফিরিয়ে দেন নি।

তার মানে এই নয় যে রাত্তিরে আমি ওর সঙ্গে এক ঘরে ছিলুম। আমি ইচ্ছে করলে যার সঙ্গে খুশি থাকতে পারি, সেটা আলাদা কথা! কিন্তু আপনি কি করে ধরেই নিলেন যে—

আমি ধরে নিই নি। ওটাই আমার প্রথম স্বপ্ন!

স্বপ্ন? আপনি আমাকে নিয়ে এই স্বপ্ন দেখেছেন?

হ্যাঁ। এবং আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এই স্বপ্ন দেখার পর আমি খুব ঈর্ষান্বিত বোধ করেছিলুম। যদিও আমি আগে কখনো আপনাকে চোখেও দেখি নি।

স্ট্রেঞ্জ!

অদ্ভুত তো বটেই। সহজে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই জন্যেই তো আমি আজ এসেছি।

আপনি কবে দেখেছেন এই স্বপ্ন?

প্রায় মাস দেড়েক আগে।

আমি জার্মানি গিয়েছিলুম অন্তত দু'বছর আগে। আর এতদিন পর আপনি সেই স্বপ্ন দেখলেন!

হ্যাঁ।

স্বপ্নটা কি রকম এবার জানতে পারি?

শুনবেন? আমি দু-একবার বিদেশে কয়েকটি জায়গায় গেছি বটে, কিন্তু জার্মানিতে এ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। কিন্তু স্বপ্নে আপনাদের হোটেলটি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হোটেলটি বেশ বড় হলেও বাইরের দিকটা সাদা-মাটা। লাল ইঁটের রং। ঠিক বলছি কি?

হ্যাঁ, মিলছে বটে। কিন্তু এসব কথা আপনি অরিন্দমের কাছ থেকে শুনেছেন।

বাকিটা শুনুন। একতলার লবির দু'পাশে চারখানা লিফ্‌ট। কিন্তু বাঁদিকের প্রথম লিফ্‌টে উঠলুম, ঠিক যেন যন্ত্রচালিতের মতন বোতাম টিপলুম সাততলার। ওপরে উঠে এসে দেখলুম, লিফ্‌টের ঠিক সামনের ঘরটির নম্বর সাতশো একুশ। তার দরজার সামনেই একজন বেল বয় কার্পেট থেকে কি যেন খুঁটে খুঁটে তুলছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে দরজার বেল টিপলুম। তখন রাত্তির পৌনে বারোটা। দু'-বার বেল বাজাবার পর দরজা খুললেন আপনি। পাতলা গোলাপি রঙের একটা নাইটির ওপর শান্তিনিকেতনী বাটিকের কাজ-করা একটা

ড্রেসিং গাউন আলগা ভাবে আপনার শরীরে জড়ানো। আপনার চোখে জল।··· আপনি আজ আমার সঙ্গে গোড়া থেকেই খুব রূঢ় আর পুরুষালি ধরণের ব্যবহার করলেও, সেদিন, অর্থাৎ সেই রাতে অর্থাৎ সেই স্বপ্নের মধ্যে আপনি ছিলেন খুবই নরম আর কোমল। মনে হয়, আপনি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিলেন, আমাকে দেখে আপনি আমার বুকে দু'হাতে কিল মেরে বললেন, তুমি এত দেরি করলে কেন? কেন···? আমি উঁকি দিয়ে দেখলুম, মেঝের ওপর একদিকে কাত হয়ে শুয়ে আছে অরিন্দম···দেখলে মনে হয় সে মৃত।

ইম্পসিবল্! এটা আপনার স্বপ্ন? আমার কাছে গুল-গপ্পো মারতে এসেছেন? এ সবই আপনি শুনেছেন অরিন্দমের কাছে।

আমি অরিন্দমের কাছে শুধু এইটুকুই শুনেছি যে জার্মানিতে এক সময়ে একই হোটেলে আপনারা দু'দিন ছিলেন। অরিন্দম অফিসের কাজে গিয়েছিল আমস্টারডামে, সেখান থেকে জার্মানিতে যায় শুধু আপনার সঙ্গেই কয়েকটা দিন কাটাবার জন্য। এ কথা সে খুব গর্ব করে বলেছে আমাকে। অর্থাৎ সে বোঝাতে চেয়েছে যে আপনার মত বিখ্যাত একজন মহিলা তার গার্লফ্রেন্ড, কুহু তাকে ছেড়ে চলে গেল, কি না গেল, তা সে গ্রাহ্য করে না। হোটেলে আপনার ঘরের দৃশ্যটির কথা কিন্তু অরিন্দম কিছুই বলেনি। ওটা সম্পূর্ণই আমার কল্পনা। মেলেনি?

ওটা আপনার কল্পনা। ফের আমার সঙ্গে চালাকি করছেন? অরিন্দম মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, এটা আপনি কল্পনা করেছেন।

আপনার কাছে আমি শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলব কেন? আমাকে যারা চেনে, তারা জানে যে আমি অকারণে মিথ্যে কথা বলি না।

হয়তো এটা অকারণ নয়!

স্বপ্নের বাকি অংশটা শুনবেন?

বলুন!

আমি অরিন্দমকে কার্পেট থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, আপনি নিষেধ করলেন। ওর জামাটামা জলে ভেজা। ওর জ্ঞান ফেরাবার জন্য আপনি ওর মাথায় এক ফ্লাস্ক কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছিলেন।

তারপর?

তার পরের অংশটা আরও অদ্ভুত। অরিন্দমকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে আপনি আমাকে বললেন ঘরের বাইরে যেতে। আপনিও বেরিয়ে এসে দরজাটা

টেনে দিলেন। আপনার খালি পা। সেই অবস্থাতেই আপনি আমায় বললেন, চল—!

শকুন্তলার দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার দেওয়াল আলমারিটা খুলল। কনিয়াকের বোতলে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে এবার সে বোতলটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চলবে?

না থাক।

সিগারেট ধরিয়ে শকুন্তলা বলল, এ রকম অদ্ভুত কাহিনী আমি জীবনে কখনো শুনিনি। তারপর?

প্রবীর বলল, আপনি আমায় বললেন, চল। আমি লিফটের দরজার দিকে গেলুম, আপনি বললেন, ওদিকে নয়। সাত তলার লম্বা করিডোর ধরে আপনি হেঁটে গেলেন একেবারে শেষ প্রান্তে। সেখানে একটা দরজার গায়ে লেখা এমার্জেন্সি এক্সিট। সেই দরজাটা খুলতেই দেখা গেল, লোহার সিঁড়ি। ফায়ার এস্কেপ। আপনি বললেন এসো। আমরা দুজনে সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম। যেন মধ্যরাত্রে আমরা হোটেল থেকে পালাচ্ছি, যদিও তার কোন দরকার ছিল না, হোটেলের দরজা সারা রাতই খোলা থাকে। যাই হোক, ফায়ার এস্কেপের একেবারে তলাটা তো মাটির সঙ্গে ছোঁয়া থাকে না, খানিকটা উঁচুতে, আমরা ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লুম মাটিতে। আপনি বললেন, উফ্। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার লেগেছে, শকুন্তলা? আপনি বললেন, না। তারপরই ছুটতে শুরু করলেন। সেখানে খানিকটা বাগান মতো। বাগানটা পার হবার পরেই একটা নদী। বেশি চওড়া নয়। আকাশে ফ্যাকাসে চাঁদের আলো, তাতে নদীটা, কী রকম যেন রহস্যময়। নদীর ধারে পুরু ঘাস, প্রায় জাজিমের মতন, আমারও ইচ্ছে করছিল জুতো খুলে ফেলতে···একটু দূরে একটা ধপধপে সাদা ব্রীজ, আর্চের মতন বাঁকানো, ঠিক যেন একটা ছবি। আপনি বললেন, চল প্রবীর, আমরা নদীর ওপারে যাই···। বলতে বলতে আপনি আবার কেঁদে ফেললেন, তখন আমি আপনার হাত ধরলুম, তারপর দুজনে খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলুম ব্রীজটার দিকে···। এইখানেই স্বপ্নটার শেষ। অনেক স্বপ্নই মানুষ ভুলে যায় আমিও কত স্বপ্ন ভুলে গেছি। কিন্তু এটা ভুলিনি, হুবহু মনে আছে।

শকুন্তলা শেষের দিকে প্রায় আচ্ছন্নের মত হয়ে গিয়েছিল। শুনছিল চোখ বন্ধ করে। এবার চোখ চেয়ে গাঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জাদুকর, না অন্তর্যামী?

প্রবীর হেসে বলল, কিছুই না। তবে, আমার স্বপ্ন দেখার রোগ আছে।

এর নাম স্বপ্ন ? কোন মানুষ কখনো এ রকম স্বপ্ন দেখে ? ইতিহাসে কেউ কোনদিন এমন কথা শোনে নি।

অনেকটা মিলে গেছে, তাই না ?

অনেকটা মানে ? আপনি সত্যি জার্মানিতে কখনো যান নি ? হোটেল ভাইমারে কখনো থাকেন নি ?

না।

অথচ হোটেলটা অবিকল ঐ রকম। সাত তলায় লিফ্‌টের ঠিক সামনেই সাতশো একুশ নম্বর ঘর। এই সব ডিটেইল্‌স তবু অরিন্দম বলতে পারে আপনাকে। বাকি যে-সব কথা অরিন্দম নিজেই জানে না···সে সত্যই সারা রাত অজ্ঞান হয়ে ছিল···আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, খুব একা একা লাগছিল, কারুকে চাইছিলুম, কথা বলার জন্য···ভীষণ পাগল পাগল লাগছিল, অরিন্দমের ওপর দারুণ রেগেই কান্না এসে গিয়েছিল···ঘর থেকে বেরিয়ে এমনিই হাঁটতে হাঁটতে দেখলুম এমার্জেন্সি এক্সিট লেখা দরজা···সেটা খুলতেই ফায়ার এস্কেপের লোহার সিঁড়ি···। এ সব কথা তো অরিন্দম জানে না! আপনি কি করে জানলেন ? সত্যি করে বলুন—

কি করে জানলুম তা যে আমি নিজেই জানি না। সে জায়গাটাও আমি আগে কখনো দেখি নি, আপনাকেও আমি আগে কখনো দেখি নি।

স্বপ্নে আমার চেহারাটা কি রকম ছিল ?

একটু অন্য রকম ছিল।

তার মানে আমার এই চেহারার সঙ্গে মেলে নি। আপনি আমাকে সুন্দরী বলে কল্পনা করেছিলেন। আজ এসে দেখলেন এক কাঠখোট্টা মেয়ে।

আপনি আপনার নিজস্ব ধরণের সুন্দর। সে কথা নয়। আপনাকে আগে কখনো চাক্ষুষ না করলেও আপনার ছবি দেখেছি, সুতরাং আপনার চেহারার একটা আন্দাজ কল্পনা করা শক্ত কিছু নয়। কিন্তু একই চেহারার মানুষকে প্রত্যেক দিন এক রকম দেখায় না। স্বপ্নে তাই আপনি একটু অন্য রকম ছিলেন।

তবু অনেক দূরের দেশে, এক মধ্যরাতে একা একা আমি নদীর ধারে হেঁটেছিলুম, আর কেউ আমায় দেখেনি···অথচ একজন অচেনা মানুষ সেটা স্বপ্নে দেখল···এটা কি করে সম্ভব ?

এ ক্ষেত্রে তাহলে বলতে হয়, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। তবে এ রকম

স্বপ্ন আমি আরও দেখেছি। সবগুলো মিলিয়ে দেখতে যাই নি, কিন্তু কয়েকটা মিলেছে। খুবই আশ্চর্য ভাবে মিলে গেছে।

কবিরা বুঝি এ রকম স্বপ্ন দেখে?

অন্য কবিদের কথা জানি না। তবে আমার অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার রোগ আছে ঠিকই।

আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। আর···ইয়ে···আপনার দ্বিতীয় স্বপ্নটা কি?

সেটা এখন থাক। পরে বলব।

পরে মানে?

পরে মানে এক্ষুণি নয়। আর একটু সময় যাক। আপনি কাজ করতে করতে থামিয়ে দিয়েছেন, আবার একটু কাজ করে নিন বরং।

এই রকম মনের অবস্থায় কেউ কাজ করতে পারে? আপনি আমায় আজ এমন একটা ব্যাপার শোনালেন,···একে অলৌকিক ছাড়া আর কি বলা যায়?

এখন বাজে সওয়া একটা। আপনি দুপুরে খান কখন? দুপুরে যদি আপনার বিশ্রাম নেওয়ার ব্যাপার থাকে, তাহলে আমি এখন চলে যেতে পারি। অন্য সময়ে আসব।

কোথায় যাবেন, বসে থাকুন চুপ করে। আপনাকে এখন আর আমি ছাড়তে পারি? আমার খাওয়া-দাওয়ার কিছু ঠিক নেই। যা হোক একটা কিছু খেয়ে নিলেই হল। আপনার খিদে পেয়েছে?

একটু একটু। যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা বলব? চলুন না, আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে নিই, খানিকক্ষণ গল্পও করা যাবে।

বাইরে? তাহলে আবার শাড়ি-ফাড়ি পরতে হবে। সে অনেক ঝামেলা। এখানেই কিছু খাবার আনিয়ে দিচ্ছি আপনার জন্য।

তাহলে আর একটা কাজ করব। ঐ যে ছেলেটি আপনার এখানে কাজ করে ···শম্ভু···ওকে দিয়ে কয়েক বোতল বীয়ার আর কিছু চীনে খাবার আনিয়ে নিলে হয় না? এখানে বসেই তাহলে বেশ একটা পিকনিকের মতন করা যায়। অবশ্য যদি আপনার কাজের অসুবিধে না হয়।

গুলি মারো কাজ! আজ আর কিচ্ছু হবে না।···শম্ভু!···শম্ভু!!

শম্ভু এসে দাঁড়াতেই প্রবীর পকেটে হাত দিল টাকা বার করবার জন্য। শকুন্তলা হাত উঁচু করে বলল, উহুঁ, ওটা চলবে না। এটা আমার বাড়ি।

প্রবীর বলল, আমি প্রস্তাব করেছি, সুতরাং দামটা আমিই দেব।

শকুন্তলার স্বভাবই হল ধমক দিয়ে কথা বলা। সেই রকম গলায় বলল, একদম নয়। টাকা বার করবে না। ছেলেরাই সব সময় দাম দেবে, ওসব মেলশ্যাভিনিজম এখানে চলবে না। তোমার চেয়ে আমার রোজগার কিছু কম না।

যে-মাটির তাল নিয়ে মূর্তি গড়ছিল শকুন্তলা, তার তলায় পুরু করে খবরের কাগজ পাতা। সেই কাগজের ভাঁজ থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করল শকুন্তলা।

শম্ভুর দিকে নোটটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোর সাইকেলটা সারিয়েছিস? যা, চট করে সাইকেল নিয়ে যা। পাঁচ বোতল খুব ঠাণ্ডা বীয়ার আনবি, আর দু'তিন প্যাকেট চীনে খাবার। কি কি আনতে হয় জানিস তো? যা, বেশী দেরী করবি না।

শম্ভু আড়চোখে বারবার দেখতে লাগলো প্রবীরকে। তার মুখে বেশ অবাক-অবাক ভাব।

শকুন্তলা তাড়া দিয়ে বললো, হাঁ করে দেখছিস কি, যা দৌড়ে চলে যা।

শম্ভু চলে যাবার পর বিনা দ্বিধায় শকুন্তলা তার আলখাল্লাটা খুলে ফেলে বলল, বড্ড গরম লাগছে।

এখন সে শুধু ব্রা আর সায়া পরা।

প্রবীর নিষ্পলক ভাবে চেয়ে রইল তার দিকে। তেমন আর যুবতী নেই শকুন্তলা। কিন্তু তার শরীরে বিশেষ মেদ জমে নি। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় বেশ দীর্ঘাঙ্গিনী গায়ের রং শ্যামলা। প্রবীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগল শকুন্তলার পিঠ, ঠিক যেন নদীর পারের মত মসৃণ ভূমি।

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, পুরুষমানুষ হিসেবে তুমি ঠিক কী রকম?

প্রবীর বলল, অর্থাৎ?

কোন মেয়েকে এই রকম পোষাকে দেখলে তোমার চোখ কি সব সময় লোভী হয়ে থাকে! না সাধারণ ভাবে কথা বলতে পারো?

প্রবীর সামান্য হেসে বলল, ঠিক জানি না। আমি অনুরোধ করবার আগেই কোন মেয়ে তো তার বাইরের পোষাক এরকম ভাবে খুলে ফেলে নি! আপাতত আমি তোমাকে ভাল করে দেখছি।

তুমি যে স্বপ্ন দেখেছিলে তাতে আমরা পরস্পরকে তুমি বলেছিলাম, তাই না?

হ্যাঁ। তুমি প্রথমেই বলেছিলে, তুমি কেন এত দেরী করে এলে ?

সত্যিই প্রবীর, আমার জীবনে তুমি এত দেরী করে এলে কেন ?

খুব বেশী তো হয়নি !

হা হা করে বেশ জোরে হেসে উঠল শকুন্তলা। হাসি যেন থামতেই চায় না। একটু সামলে নিয়ে আবার বলল, কী রোমান্টিক কথাবার্তা ! ঠিক যেন বাংলা সিনেমার মতন। তুমি মাইরি সত্যি একটা অদ্ভুত লোক। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার দিল্-এ চাক্কু চালিয়ে দিয়েছ !

প্রবীর বলল, আমি জানি তুমি ইংরেজী স্কুলে-পড়া মেয়ে। এক সময় পর্যন্ত খুব মেমসাহেব ছিলে। বিদেশ থেকে ফিরে খুব বাঙালী হয়েছ। এই ধরণের কথা যে তুমি নতুন বলতে শিখেছ, তা তোমার উচ্চারণ শুনলেই বোঝা যায়।

বেটার লেট দ্যান নেভার। তুমি বুঝি খুব শুদ্ধ সংস্কৃত টাইপের কথা বলা পছন্দ কর ?

না। যার যা স্বাভাবিক, সেটাই আমার পছন্দ। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

একটা কেন, যতগুলো খুশি, সারা দুপুরটাই তো তোমাকে দিয়েছি।

এই বাড়িতে কি তুমি একা থাকো ? এই বাড়িটা কেমন যেন বাংলা সিনেমার সেটের মতন। একজন মহিলা শিল্পী···আর একটি মাত্র চাকর, আর কেউ নেই ? কোন আত্মীয়-স্বজন ?

এই বাড়িটা আমার নয়।

কার ?

আমার ভূতপূর্ব স্বামীর। শুভব্রতর। ডিভোর্সের পর আমার এ বাড়িটা ছেড়ে দেবার কথা ছিল, কিন্তু এখানে আমার স্টুডিও, গোডাউন, সব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা। তাই শুভব্রত আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে। এর জন্য আমি মাসে মাসে ওকে আটশো টাকা ভাড়া দিই। অবশ্য অন্য লোককে ভাড়া দিলে এর বেশী পেতে পারত। পুরোনো বউকে শুভব্রত এইটুকু ফেবার করেছে।

বেশ বড় বাড়ী।

হ্যাঁ। শুভব্রত এখন থাকে ওর কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে। এ বাড়িতেও একটা ঘর ও নিজের জন্যে রেখে দিয়েছে, ভাড়াটাকে পুরো বাড়ির পজেশান দিতে নেই কি না। শুভব্রত মাসে একদিন দু'দিন এখানে থেকেও যায়। উই আর কোয়াইট ফ্রেন্ডলি। ধর এখন যদি শুভব্রত হঠাৎ এসে পড়ে—

সে রকম আসার সম্ভাবনা আছে ?

কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি ?

ভয় নয়, একটা অপ্রীতিকর অবস্থা যদি হয়—

না। শুভব্রত এরকম অসময়ে কখনো আসে না। আমি বলছি, ধর দৈবাৎ যদি এসে পড়ে, তাহলেও তোমাকে দেখে সে একটুও বিরক্তি প্রকাশ করবে না। তোমার সঙ্গে গল্প করবে। সে অতি ভদ্র। বেশী মাত্রায় ভদ্র। বাই দা ওয়ে, তুমি শুভব্রতকেও চেনো নাকি ?

না।

যাক, বাঁচা গেল।

তার মানে তুমি এত বড় বাড়িতে বলতে গেলে একাই থাকো ?

তা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে দেখছি। একা থাকতে আমার খারাপ লাগে না। আমার ভূতের ভয় নেই।

আর তোমার মেয়ে ?

তুমি সে-খবরও রাখো! এটাও স্বপ্নে দেখেছ নাকি ?

না। তবে জানা তো এটা অস্বাভাবিক কিছু না। শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে তোমার জীবন বহু আলোচিত। তোমার একটি মেয়ে আছে শুনেছি।

এখন তার বয়েস তেরো। সে কার্শিয়াঙে পড়ে। ছুটিতে আসে। আই অ্যাম আ ব্যাড মাদার। আমি মেয়ের খুব একটা খোঁজ খবর নিতে পারি না। তবে ওর বাবা নেয়। আমার মেয়ে যখন ছোট ছিল, তখন ওর একটা মূর্তি করেছিলাম, দেখবে ?

হ্যাঁ।

তাহলে ওপরে যেতে হবে। আমার বেডরুমে আছে।

এসো।

তবে এখন থাক। পরে দেখব।

শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, প্রবীরের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে থমকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল।

তারপর হেসে উঠল প্রবলভাবে। হাসির তোড়ে তার বুকটা যেন এক্ষুনি ফেটে পড়বে।

প্রবীর মেয়েদের হাসির শব্দ খুব পছন্দ করে। এমন উচ্ছল হাসি খুব বেশি শোনা যায় না।

হাসি থামিয়ে শকুন্তলা বলল, সত্যি মাইরি, তুমি ভারি মজার লোক।

প্রবীর বলল, আমাকে দেখে যে তুমি মজা পাচ্ছ, এটা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের কথা।

মূর্তিটা আমার বেড-রুমে আছে শুনে তুমি যেতে চাইলে না?

না, সে জন্য নয়।

ফাঁকা বাড়ি, একটি মেয়ে তোমায় বেড-রুমে নিয়ে যেতে চাইল, তবু তুমি যেতে চাইলে না? তুমি কী রকম কবি গো?

কবি মানেই বুঝি নেকড়ে বাঘ?

অন্তত পুরুষমানুষ তো হবে।

ফাঁকা বাড়িতে যে-কোন জায়গাই তো বেড-রুম হতে পারে তাই না?

তুমি কি সত্যি সত্যি ভেবেছিলে নাকি যে আমি ঐ রকম কিছু ভেবেই তোমায় বেডরুমে নিয়ে যাবার কথাই বলেছিলুম?

তুমি সে-রকম কিছু মীন করনি নিশ্চয়ই, কিন্তু বেডরুমে শুনলে আমার মনে ঐ রকম চিন্তাই আসে। আচ্ছা, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুমি বোধ হয় পুরোপুরি বাঙালী নও, তাই না!

পুরোপুরি মানে?

তুমি বাংলার বাইরে কোথাও মানুষ হয়েছ?

কি করে বুঝলে?

তোমার কথা…দু-একটা উচ্চারণ যেন অন্য রকম।

তোমার কান আছে বলতে হবে।

কবিদের তো ওটাই প্রধান সম্বল।

আমার মা ছিল গুজরাতি। আমি জন্মেছি আমেদাবাদে। তারপর বেশ কিছুদিন ছিলাম এলাহাবাদে। ওখানেই স্কুলে পড়েছি। অনেক দিন পর্যন্ত ভাল বাংলা বলতেই পারতুম না। পরে নিজের চেষ্টায় শিখেছি। আমার ধারণা ছিল, আমার বাংলায় এখন কোন ভুল নেই, কেউ ধরতে পারে না।

তোমার বাংলায় ভুল নেই, একটু টান আছে শুধু।

আমার বাবা খুব সাহেব ধরণের মানুষ। বাংলা খুব কম বলতেন, আর গুজরাতি তো শেখেনই নি। আমার মনে আছে, আমি বাবাকে একবার পরিণীতা শব্দটার মানে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বাবা বলতে পারেন নি। বাবা বললেন, দাঁড়া, সুধীনকাকাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করছি। বাবার এই সুধীনকাকা

কে জানো? তোমাদের সুধীন দত্ত। কবি। কী চমৎকার চেহারা ছিল। আমি সুধীন দত্তের একটা মূর্তি গড়তে চেয়েছিলাম, কাজ শুরু করার আগেই উনি মারা গেলেন।

গ্রেট লস। তুমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটা স্কাল্‌পচার করলে সেটা একটা সম্পদ হয়ে থাকত।

দেরী হয়ে গেল কেন জানো? আমি তখন কিঙ্করদার ছাত্রী, ওঁকে বলেছিলুম, উনি খুব একটা উৎসাহ দেখান নি। উনি বলেছিলেন, এখনই কী, আগে ভাল করে কাজ শেখো। আসলে, কিঙ্করদা পুরুষদের মূর্তি গড়া বেশী পছন্দ করতেন না। অনেকে জানে না, আমি কিঙ্করদার জন্য অনেকবার মডেল হয়েছি।

নুড?

আমি ভিয়েনার একজন শিল্পীকে জানি, যিনি শুধু যদি মুখটা স্টাডি করতে চান, তাহলেও মেয়েদের ন্যাংটো করে বসিয়ে রাখেন।

এ কথা বলার পর শকুন্তলা অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজল। তারপর চটের ড্রেসিং গাউনটা তুলে নিয়ে শরীরে জড়াল।

যদি তোমার গরম লাগে, তা হলে ওটা খুলে রাখতে পারো। আমার কথা বলতে অসুবিধে হবে না।

তুমি আমার চোখের দিকে তাকালে না। তুমি আমার শরীর দেখছো। আমার লজ্জা করছে।

সত্যি······মানে······লজ্জা করছে?

কেন। আমার কি লজ্জা সরম থাকতে নেই? আসলে, আমি একা থাকি বলেই অনেক সময় অন্যমনস্ক ভাবে জামা কাপড় খুলে ফেলি। তোমার মতন কোনো পুরুষ একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে তখন খেয়াল হয় যে আমার শরীরটা আর সুন্দর নেই।

তুমি এখনো খুব সুন্দর! তোমার শরীরটা যেন কোনারক মন্দিরের কোন মূর্তির মতন।

থাক, আবার বাংলা সিনেমার মতন ডায়ালগ দিতে হবে না।

তোমার বাবা-মা এখন কোথায়?

চুলোয় যাক আমার বাবা-মায়ের কথা। তুমি রিপোর্টারের মতন আমার জীবনী জেনে নেবার চেষ্টা করছ কেন? তোমার নিজের কথা কিছু বলছ

না। তুমি একজন কবি, ব্যস। হাওয়া থেকে জন্মেছ?

আমার জীবনে কোন গল্প নেই।

তুমি একটা মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছ বলেই তার কাছে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছ? কেন, তোমার বাড়িটাড়ি নেই? কোন কাজকর্ম নেই?

সবই আছে।

তবে?

রোজ কেউ কাজ করে না, সারাক্ষণ কেউ বাড়িতে বসেও থাকে না। আমি তোমার কাছে বেড়াতে এসেছি।

সত্যি করে বল না, জার্মানির ঐ গল্পটা তুমি কার কাছে শুনেছ? আমার জীবনে একদিন যা ঘটেছিল, তা হুবহু অন্য কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে? অসম্ভব! গাঁজাখুরি ব্যাপার।

সেদিন তুমি একলা ছিলে···

তা ছিলুম বটে, তবে পরে হয়তো আমি অন্য কারুকে ঘটনাটা বলেছিলুম··· তুমি তার কাছ থেকে শুনেছ!

অরিন্দমকে বলেছিলে?

না, ওকে বলি নি, এটা সিওর। ও তো সারারাত অজ্ঞান হয়েই রইল বলতে গেলে। আমি নদীর ধার থেকে যখন ফিরে এলুম, তখনও ও একই রকম ভাবে শুয়ে। ওকে আর ডাকি নি। পরদিন সকালবেলা ওর হ্যাংওভার কাটতে কাটতেই বেজে গেল বেলা এগারোটা। আমি তার আগেই সেমিনার অ্যাটেণ্ড করতে চলে গেছি। সন্ধ্যেবেলা ডিনার পার্টি ছিল, তারপর সেখান থেকে একজন আমাদের নিয়ে গেল লং ড্রাইভে, আমি গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম··· তার পরদিনই তো ফেরা—।

ফিরে এসেও তো অরিন্দমের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে অনেকবার—

তা হয়েছে, কিন্তু ওকে সেই রাতের কথা আর কখনও বলি নি। সেই প্রসঙ্গ তুললে ও লজ্জা পাবে। কিন্তু সেই হোটেলে কি অন্য কোন চেনা লোক ছিল, যে আমায় দেখেছিল?

আমি অন্য কারুর কাছ থেকে এ ঘটনা শুনি নি।

তোমার দ্বিতীয় স্বপ্নটা এবার বল তো। দেখি এটা কতখানি মেলে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটা মিলবে না।

তার মানে?

তোমাকে নিয়ে দ্বিতীয় যে স্বপ্নটা আমি দেখেছি, সেটা প্রায় একই রকম, সেটা এখনো ঘটে নি। সেটা ভবিষ্যতের।

সেটা তোমার কল্পনা না স্বপ্ন?

স্বপ্ন।

দ্বিতীয়টা তুমি এখনো বলবে না?

এখনো সময় হয় নি।

শুভব্রতর সঙ্গে খুব ঝগড়া হবার পর আমার খানিকটা নার্ভাস ব্রেক ডাউনের মতন হয়। মেয়েকে নিয়ে আমি তখন শিমুলতলায় চলে যাই। অরিন্দম একটা বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই বাড়িটায় ঢুকেই মনে হল, ওখানে আমি আগে থেকেছি। সিঁড়ি দিয়েই দোতলার ক'টা ঘর, কোথায় বাথরুম সব আমার আগে থেকে জানা। সামনের বাগানটাও আমার খুব চেনা। অথচ আমি জন্মে শিমুলতলায় যাই নি। পুরো জায়গাটাই আমার ভীষণ চেনা লাগছিল।

এ রকম হয়, শুনেছি।

এটাও তোমার ঐ স্বপ্নের মতন নয়?

স্বপ্নে অচেনা কোন মানুষকে দেখেছ কখনো?

মনে তো পড়ে না।

আমি তোমাকে দেখেছি।

স্বপ্নে আমায় যেমন দেখেছিলে, তার তুলনায় আমায় এখন কী রকম দেখছ?

তোমায় আমি এখনো দেখি নি ভাল করে। দূর থেকে একটা পাহাড়কে দেখায় এক রকম, কাছে গেলে একদম অন্য রকম। দূর থেকে এক পলকেই গোটা পাহাড়টা দেখা হয়ে যায়। কাছে এসে দেখতে হয় অনেকক্ষণ ধরে।

দূর থেকে এক একটা পাহাড় দেখে আমার মনে হয়, ওর আকৃতিটা একটু বদলে দিই। ওর মাথার দিকটা ভেঙে ওখানে একটা অন্য মাথা বসাই। তাহলে একটা চমৎকার কাজ হয়ে যাবে।

পাহাড়ের কাছে গেলেও কি সেই রকম মনে হয়?

প্রবীর, তুমি আমাকে খুব কাছ থেকে দেখবার চেষ্টা করো না। তাহলে দুঃখ পাবে।

হঠাৎ এ কথা?

আমি মেয়ে হিসেবে ভাল নই, আমি বিপজ্জনক। আমার কাছাকাছি যারা

আসে তারা নিজেরাই ভেঙে যায়। এ রকম কয়েকবার হয়েছে।

এতক্ষণ বাদে, তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে, শকুন্তলা। তুমি কি আমায় তোমার পাশে গিয়ে বসবার অনুমতি দেবে? আমি তোমাকে ছুঁয়ে কথা বলতে চাই।

ইডিয়েট, দরজায় খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না? দেখো কে এসেছে, শম্ভু ফিরল বোধহয়।

প্রবীর উঠে গিয়ে সদর দরজা দেখে এসে বললে, না, শম্ভু নয়। একজন ফেরিওয়ালা।

কিন্তু প্রবীর নিজে থেকে শকুন্তলার পাশে বসল না।

শকুন্তলা প্রবীরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল, একজন পুরুষ আর একজন নারী নিরালায় এক ঘরে বেশীক্ষণ এমনি এমনি বসে থাকতে পারে না, তাই না?

প্রবীর ইয়ার্কির সুরে বলল, শাস্ত্রে সেই জন্যই বলেছে, ঘি আর আগুন।

ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কে ঘি আর কে আগুন বল তো?

পুরুষ মানুষরাই তো শাস্ত্র লিখেছে, তাই আগুনই পুরুষ।

ভুল!

একালের কবিরা কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে আগুনেরই তুলনা দেয়।

একটা কথা বল তো প্রবীর। শিল্পী-সাহিত্যিকদের আড্ডায় নাকি আমার জীবন-কাহিনী নিয়ে আলোচনা হয়। আমার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? আমি যখন তখন যার তার সঙ্গে শুই?

তুমি সে রকমই একটা ইমেজ তৈরি করে রেখেছ বটে। তবে ইমেজের সঙ্গে তো আসল মানুষটা মেলে না।

তুমিও সেই ধান্দাতেই এসেছিলে আমার কাছে।

বারবার এই রকম ভাবে আমাকে গদ্যের চাবুক মারছ কেন? বেশী গদ্য আমার পছন্দ নয়।

অর্থাৎ?

আমি শোওয়া-শুয়ির ধান্দায় যে-সে মেয়ের কাছে যাই না। কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হলে, তাকে আমার ভাল লাগলে তারপর শোওয়ার কথা চিন্তা করি।

তুমি ওপরে আমার ঘরে গেলে দেখবে পিকাসো আর রঁদার দুটো বড়

প্লাস্টার কাস্টিং আছে। আমি ওঁদের চুমু খাই মাঝে মাঝে। জড়িয়ে ধরি। রবীন্দ্রনাথের এক একটা গান শুনলে মনে হয়, উনি আমায় আদর করছেন। এমন প্রায়ই হয়, আমার মনে হয়েছে, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আছি। আমার চেয়ে যাঁরা অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, আমি তাঁদের সাহচর্যে আনন্দ পাই। সাধারণ পুরুষ মানুষের সঙ্গে শারীরচর্চা আমার পছন্দ নয়, তাদের গায়ের গন্ধই আমি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

জল যেমন জলকে চায়, মানুষও তেমনি মানুষকে চায়। ছবি, গান, মূর্তি —এ সব কারুর সর্বক্ষণের সঙ্গী হতে পারে না। দু-তিন মাস কোন মানুষকে, নারী-পুরুষ যে-ই হোক, অন্য কোন মানুষ যদি আলিঙ্গন না করে, তাহলে তার মনের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সে পুরোপুরি সুস্থ থাকে না।

বটে ?

এটা তুমি অস্বীকার করতে পারো ?

আমি একা থাকি। ডিভোর্সী মেয়েমানুষ, সুতরাং আমাকে আলিঙ্গন করার জন্য অনেকেই ব্যগ্র, তাই না ?

আন-অ্যাটাচ্‌ড মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের বেশী আগ্রহ থাকে। তুমিই তো একটু আগে বললে। তুমি ঠিকই বলেছো অনেকটা।

তোমারও সেই রকম আগ্রহ ?

আমার থুতনিতে কারুর জুতো সুদ্ধ পায়ের লাথি খাবার সাধ নেই।

বালাই ষাট, তোমায় লাথি মারব কেন ? তুমি আমায় স্বপ্ন দেখেছ তুমি আমার মাণিক, এসো, হাত বাড়িয়ে আছি, আমায় আলিঙ্গন দাও !

এবার বোধহয় সত্যিই শম্ভু এসেছে দরজায় শব্দ পাচ্ছি !

বেরসিক !

শম্ভুর কাছে চাবি থাকে, সে নিজেই দরজা খুলে ঢুকল। কাঁধে ঝোলানো থলি নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে বীয়ারের বোতল আর খাবারের প্যাকেট। বুদ্ধি করে সে বীয়ারের বোতল খোলার চাবিও এনেছে।

সব কিছু নামিয়ে রাখার পর শকুন্তলা শম্ভুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, হিসেব দে !

হোটেলের বেয়ারাদের মতন শম্ভু গড় গড় করে কতকগুলো অঙ্ক বলে গেল। তারপর পকেট থেকে থেকে বার করল পাঁচটা টাকা।

শকুন্তলা বলল, শম্ভুকে যখনই কিছু আনতে দিই, ও ঠিক পাঁচ টাকা ফেরত

দেয়। যদি আরও অনেক কিছু আনতে বলতুম, তাহলেও ঐ পাঁচ টাকা ফিরত।

শম্ভু বলল, না দিদিমণি, আরও কুড়ি টাকা আছে, অন্য পকেটে।

শকুন্তলা বলল, সে কী রে! তাহলে তো আমি বড়লোক!

প্রবীর বলল, তোমার একলার সংসারটি বেশ ভালই চলে দেখছি।

শকুন্তলা শম্ভুকে বললে, যা, তুই এবার খেয়ে নে।

প্রবীর বীয়ারের বোতল খুলে জিজ্ঞেস করল,—শকুন্তলা তোমার গেলাস লাগবে?

শকুন্তলা বলল, নিশ্চয়ই। গেলাসের ওপরেই তো অনেকখানি নির্ভর করে।

দেওয়াল আলমারি খুলে সে দুটি গেলাস বার করল। পাতলা ফিনফিনে কাচের, খুবই শৌখিন গেলাস।

শকুন্তলার ঘরটি যেমন অগোছালো, তাতে এ রকম গেলাস এখানে আশাই করা যায় না। মনে হয়, একটু শক্ত মুঠোয় ধরলেই ভেঙে যাবে।

খুব যত্ন করে ফেনা সরিয়ে বীয়ার ঢালল প্রবীর।

শকুন্তলা নিজের গেলাস উঁচু করে তুলে বলল, তোমার স্বপ্নের জন্য।

তারপর এক চুমুক দেবার পর বলল, এবার বল তো, প্রবীরকুমার, তুমি আর কোন্ কোন্ মেয়েকে নিয়ে এরকম স্বপ্ন দেখেছ?

প্রবীর বলল, আমি স্বপ্ন একটু বেশি দেখি। তার কারণ বোধহয়, আমার বায়ুরোগ আছে। সব স্বপ্নের মধ্যেই নারী পুরুষের চরিত্র থাকে। তবে তোমারটা যেমন পরিষ্কার ছবির মতন দেখেছি, সব স্বপ্ন সে রকম হয় না। আর তোমার মতন অচেনা মেয়েকে নিয়ে আমি একটাই শুধু স্বপ্ন দেখেছি, যতদূর মনে পড়ে।

সে মেয়েটি কে? বিখ্যাত কেউ?

তোমার চেয়ে অনেক বেশী বিখ্যাত।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, নাম বলো না, আমায় আন্দাজ করতে দাও⋯সুচিত্রা মিত্র?

ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সুতরাং তিনি অপরিচিতা নন। যাঁকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি সেই মহিলার নাম ইন্দিরা গান্ধী।

আচ্ছা! তা ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখলে?

অনেকদিন আগেকার কথা, প্রায় বারো চৌদ্দ বছর হবে। মোট কথা সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী সবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমি তখন বরাকরে থাকি।

সেখানে কি করতে?

একটা চাকরি করতুম। বেশ সাধারণ চাকরি। দিশেরগড় বলে একটা

জায়গা আছে, জানো? সেখানে। মাঝে মাঝে আমি গ্রামের দিকে যেতুম, মহুয়ার সন্ধানে। একদিন দেখলুম, একটা পুকুর থেকে স্নান করে উঠে আসছেন ইন্দিরা গান্ধী—মানে এটা স্বপ্ন—ইন্দিরা গান্ধী একদম একা, কোন বডি-গার্ড নেই, সেক্রেটারি-ফেক্রেটারি কেউ নেই, ভিজে কাপড়ে উনি উঠে এসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন—যেন আশা করেছিলেন তোয়ালে আর শুকনো পোশাক কেউ এগিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ এলো না। উনি অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগলেন, শুধু তাই নয়, এক সময় দেখলুম, উনি ছেলে মানুষের মতন কাঁদছেন।

তখন তুমি নিয়ে এলে তোয়ালে?

না। এই স্বপ্নে আমি কোথাও ছিলুম না। শুধু ওঁকে একাই দেখেছি। কেন যে আমি এ রকম স্বপ্ন দেখি, তার কোন মাথা মুণ্ডু বুঝি না।

তারপর কি তুমি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলে? ওঁকে বলেছিলে, ম্যাডাম, আমি আপনাকে এই রকম অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি।

উনি আমায় পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না তাহলে।

তবে তুমি আমার কাছে এলে কেন? আমিও তো তোমায় পাগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না! আমার কাছে না এসে তোমার উচিত ছিল কোন পাগলের ডাক্তারের কাছে যাওয়া।

তোমার কাছে এলাম···তার কারণ···তুমি ইন্দিরা গান্ধীর মতন অনধিগম্য নও, তাছাড়া···তুমি সেই স্বপ্নের মধ্যে আমাকে বলেছিলে, তুমি এত দেরী করে এলে, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। স্বপ্নটা দেখার পর প্রায় একমাস ধরে চিন্তা করলুম···আজ সকালেই হঠাৎ মনে, হল সত্যিই হয়তো আমার সঙ্গে তোমার অনেক কথা থাকতে পারে। সেই জন্যই এলুম।

তোমাকে আমি চিনি না, অথচ তোমার সঙ্গে আমার কী করে কথা থাকবে?

চেনা অচেনাটা কোন ব্যাপারই নয়। কারুকে না কারুকে তো কিছু বলতে হবে।

আমি কথা বলি মাটির সঙ্গে, পাথরের সঙ্গে, দেয়ালের সঙ্গে, এমন কি আমার বারান্দাটার টবে যে গাছগুলো আছে, তাদের সঙ্গেও। তারা আমার কথা বোঝে। মানুষ বোঝে না।

মানুষ তো অনেক রকম।

আমি অনেক দেখেছি।

তোমার কোন মেয়েবন্ধু নেই ?   কোন প্রাণের বান্ধবী ?

আমার মতন মেয়ের সঙ্গে অন্য কোন মেয়ের বন্ধুত্ব হতে পারে না। জানো, এক সময়, বছর পাঁচেক আগে, কোন একটা কারণে আমি সম্পূর্ণ পুরুষ জাতটার ওপরই এমন রেগে গিয়েছিলুম যে তখন ভেবেছিলুম, ও শালাদের আর কোনদিন ছুঁয়েও দেখব না। তাই লেসবিয়ানিজম ট্রাই করেছিলুম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ জিনিসটা আমার মধ্যে নেই। একদম নেই। একটুও আনন্দ পেলুম না। কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না করছিল।

পুরুষ জাতের ওপর রাগ হয়েছিল কেন ?

কেন শুনবে ?   ওরা মেয়েদের স্বাধীনতার কোন মূল্য দিতে চায় না। কত পুরুষ যেমন একা স্বাধীনভাবে থাকে ঠিক সেইরকম ভাবে থাকার যোগ্যতা আমার আছে। আমি নিজে যথেষ্ট রোজগার করি, নিজের সব কাজ নিজে চালিয়ে নিতে পারি। আত্মরক্ষার ক্ষমতাও আমার আছে। তবু কেউ না কেউ এসে বলবে, ইস, তুমি একা আছ। তোমার নিশ্চয়ই কোন সাহায্যের দরকার। কিংবা তোমার নিশ্চয়ই কোন প্রেমিক দরকার, কাঁচা বাংলায় যাকে বলে নাঙ। কোন পুরুষ যদি একা থাকে, মেয়েরা কি সেধে সেধে গিয়ে এরকম কথা বলে ? মহা খচ্চর এই পুরুষগুলো !

তুমি পুরুষদের এত গালাগাল দিচ্ছ, আমিও তো তাদেরই একজন প্রতিনিধি।

তোমাকে বাদ দেবার কোন কারণ তো এখনো ঘটে নি ?

তুমি যখন আ... রেখেছিলে— ...

... হাঁ, সেটা তোমাকে লোভ দেখাবার ... আমার শরীরটা ...কিছু লোভনীয়ও নয়।

আমাকে লোভ দেখাবার তো কোনো দরকার নেই। আমি ... তো যেচেই তোমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছি।

তবে পুরুষদের আমি ভালওবাসি। এক একটা পুরুষ খুব হাড় হারামজাদা হয় বটে, তবু খুব ইন্টারেস্টিং। এক একটা পুরুষের চরিত্রে তিন রকম দিক আছে, মেয়েদের তা থাকে না সাধারণত। অধিকাংশ মেয়েই একমুখী। দিল্লিতে যখন আমার 'সূর্যের রথ' মূর্তিটা বসানো হয়, সেই সময় একটা বেশ বড় ফাংশান হয়েছিল, তাতে আমি একজনকে দেখি, ভদ্রলোক কাশ্মীরী, এরকম নির্লজ্জ মেয়েবাজ আর হয় না, প্রত্যেকটা মেয়ের সঙ্গে একই রকম ন্যাকামি করছে, তবু লোকটা কী লাভেবল, ওর দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

মনে কর, একটা বড় লোমওয়ালা সাদা ফুটফুটে কুকুর, দারুণ দুষ্টু, এটা ভাঙছে, ওকে তাড়া করছে, তবু যেমন তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। অনেকটা সেই রকম।

ধন্যবাদ।

কিসের জন্য ?

পুরুষমানুষদের প্রশংসা করবার জন্য। দিল্লিতে তোমার 'সূর্যের রথ' আমি দেখেছি। অপূর্ব সুন্দর কাজ। কী ম্যাসিভ! তবু মনে হয় ঠিক যেন উড়ে যাচ্ছে।

এই প্রথম তুমি আমার কোন কাজের প্রশংসা করলে।

আমি মাত্র দু-তিনটিই দেখেছি।

আমি অবশ্য তোমার কোন লেখাই পড়ি নি।

তাতে তোমার আত্মার কোন ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু আমি পড়তে চাই। তোমার বই আমাকে দেবে ?

অর্থাৎ এর পরেও তুমি আমায় আসতে বলছ।

তুমি যা নাছোড়বান্দা পার্টি, আমি না বললেও তুমি ঠিকই আসতে।

প্রবীর হো হো করে হেসে উঠল।

শকুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বস, একটু আসছি।

দরজা টেনে সে বাইরে চলে গেল। প্রবীর নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগল বীয়ারে।

আজ সকাল থেকে সে নিজের ব্যবহারে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। আজ সে যেন একজন নতুন মানুষ। এর আগে কারুর সঙ্গে সে সেধে আলাপ করতে যায় নি। ফাঁকা বাড়িতে এরকম একটি মেয়ের সঙ্গে বসে সে বীয়ার খাচ্ছে, কিন্তু এখনও প্রবীর সেই মেয়েটির বুকে হাত দেয় নি, কিংবা দেবার চেষ্টা করে নি, এ তো প্রায় অবিশ্বাস্য।

কিন্তু প্রবীর বেশ উপভোগ করছে এই সংযম। এর মধ্যে বেশ কিছুটা পবিত্রতাবোধ আছে। অবশ্য কতক্ষণ সে এ রকম পারবে, তা সে নিজেই জানে না।

শকুন্তলা ফি..রে এলোতে একটা বেশ বড় সাইজের বাঁধানো খাতা।

সেই খাতাটা দিয়ে প্রবীরের মাথায় আলতো করে একটা চাঁটা মেরে বলল, এ কী, খাবার খাচ্ছ না কেন ? খাও, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

প্রবীর বলল, তুমিও কিছু খাও নি। এসো, কিছুটা খেয়ে নেওয়া যাক। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এদিকে বীয়ারও গরম হয়ে যাচ্ছে!

শকুন্তলা মেঝেতে বসে পড়ে বলল, তুমি কী মাইরি! সেই সকালবেলা এসেছ, এর মধ্যে একবার বাথরুমেও গেলে না?

প্রবীর বলল, একবার গিয়েছিলুম, ঐ যে তুমি আমার মুখে মাটি ছুঁড়ে মারলে? সেই কাদা ধোবার জন্য…

আমি তোমায় মাটি ছুঁড়ে মেরেছিলুম? কখন? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক এক সময় আমার এমন রাগ চড়ে যায়…তুমি যেন কী একটা বাজে কথা বলেছিলে সেই সময়।

ভাগ্যিস কাদা ছুঁড়ে মেরেছিলে! সেই জন্যই তো তোমার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি ভাব হল।

ভাব হয়েছে নাকি এখনো?

তুমি আমাকে তাড়িয়েই দিচ্ছিলে, তার বদলে এখন পাশাপাশি বসে বীয়ার খাচ্ছি, একে ভাব বলে না?

মানুষ আসলে মানুষকে বিশ্বাস করে না। দুজন অচেনা মানুষ কাছাকাছি এলে প্রথম প্রথম কেমন যেন শত্রুর মতন ভাব করে থাকে। মুখে হাসি মাখা থাকলেও একজন সব সময় বুঝতে চেষ্টা করে, অন্য ব্যাটার মতলব আসলে কী? জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের খুব বেশি তফাত নেই।

ঐ মুখের হাসিটাতেই তফাত।

হ্যাঁ, তা ঠিক। একমাত্র মানুষই ভেতরে ভেতরে শত্রুতা করেও মুখে হাসতে পারে।

তুমি কি এখনো ভাবছ, আমার আসল মতলবটা কী?

এখনো খানিকটা ধাঁধার মধ্যে আছি, তা ঠিকই। তুমি জোচ্চোর কিংবা নেকড়ে বাঘ নও, তা বুঝেছি, কিন্তু কোন্ টানে তুমি আমার কাছে এসেছ…

সঠিক কোন যুক্তি আমি দিতে পারব না। তুমি তোমার সব রকম ব্যবহারের যুক্তি দিতে পারো? স্বপ্নের যেমন যুক্তি নেই।

এসো, তোমায় আমার এই খাতাটা দেখাই। কাছে সরে এসো, আমার গেলাসে আর একটু বীয়ার ঢেলে দাও।

শকুন্তলা খাতাটা খুলল।

প্রথম পাতায় একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড় আর শাল বন। জল রঙে

আঁকা। কাঁচা হাতের কাজ, পরিষ্কার গোপাল ঘোষের অনুকরণ।

শকুন্তলা বলল, এটা আমার সতেরো বছর বয়েসে আঁকা। আরও অনেক ছোট বয়েস থেকে আমি ছবি আঁকি। কিন্তু আগেকার কিছু নেই। কিন্তু এই খাতাটায় আছে আমার সতেরো থেকে উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত আঁকা ছবি কয়েকটা। এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আঃ, এখনো সেই বয়েসটার কথা ভাবতেই আমার কষ্ট হয়। সেই সময় একবার দুমকা গিয়েছিলুম, এই ছবিটা সেখানেই আঁকা। আমি সে বছর প্রথম শাড়ি পরেছি, এলাহাবাদে থাকার সময় আমি শালোয়ার-কামিজ পরতুম। একটা ছোট্ট টিলার ওপর বসে সারা দুপুর ধরে একা একা এঁকেছিলুম, দারুণ রোদ ছিল, অথচ একটুও কষ্ট হয় নি।

সেই ছবিটা খুব সুন্দর।

কোন্ ছবিটা ?

একটি সতেরো বছরের মেয়ে টিলার ওপর বসে মগ্ন হয়ে ছবি আঁকছে।

আর আমার আঁকা ছবিটা বুঝি ভাল হয় নি ?

সতেরো বছরের মেয়ের আঁকা হিসেবে খুবই ভাল বলতে হবে !

তুমি খুব পোলাইট। আচ্ছা, এর পরের ছবিটা কেমন বল তো ?

পরের ছবিটি একেবারে অন্যরকম। দাড়িওয়ালা এক ক্লান্ত বৃদ্ধের আবক্ষ মূর্তি, কাঁচা ইঁটের মতন লাল রঙের ব্যবহারই বেশি।

সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে ধরে হাসি মুখে শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে রইল প্রবীর !

শকুন্তলারও ঠোঁটে চাপা হাসি। সে জিজ্ঞেস করল, এ ছবিটা কেমন লাগছে বল ?

প্রবীর হাসতে হাসতে বলল, রুয়োর 'ওল্ড কিং'-এর খুব চমৎকার কপি করেছ।

সত্যিকারের বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল শকুন্তলার মুখে। প্রবীরের চোখে গাঢ় দৃষ্টি রেখে সে বলল, তুমি দেখছি ছবির ব্যাপারে একেবারে গবেট নও। রুয়োর ছবি দেখে চিনতে পারো—

প্রবীরের কাঁধে হাত রেখে শকুন্তলা বলল, এ জন্য তোমায় একটা চুমু দিতে পারি—

শকুন্তলা মুখটা এগিয়ে আনলেও প্রবীর স্থির থেকে বলল, এখন নয়। তুমি যে আমাকে একটু ছুঁয়েছ, সেটাই যথেষ্ট।

শকুন্তলা দ্বিতীয়বার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ আবার কী ধরনের ন্যাকামি ? তুই শালা কি চুমু খেতেও জানিস না নাকি ? ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানিস না ?

সব কিছুর জন্যই একটা বিশেষ সময় আছে তো ?

এটা চুমু খাবার সময় নয় ? বীয়ার ভেজা ঠোঁটে চুমু খেতেই তো সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

প্রবীর ইঙ্গিতপূর্ণ স্বরে বলল, না। এখনো সময় হয় নি।

হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠল শকুন্তলা সে কোথায় যেন আহত হয়েছে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে আধ-বসা হয়ে সে তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলল, আজ শালা তোকে আমি জোর করে চুমু খাব। মেয়েদের একলা পেলেই ছেলেরা যেমন জোর করার চেষ্টা করে···আজ আমিও···। একটা বেশ লালটু মার্কা ছেলে পেয়েছি—

শকুন্তলা এগিয়ে আসতেই প্রবীর বেশ দৃঢ় গলায় ধমক দিয়ে বলল, ও রকম কোরো না, শকুন্তলা, শান্ত হয়ে বসো !

একটু থমকে গিয়ে শকুন্তলা বলল, এ সব কী হচ্ছে বল তো ?

প্রবীর গলার আওয়াজ বদলে কৌতুক সুরে বলল, যেমন রহস্যময়ী নারী হয়, সেই রকমই আমি এক রহস্যময় পুরুষ ধরে নাও। বরং তোমার ছবি দেখাও।

দূর ছাই !

খাতাখানা ছুঁড়ে ঘরের এক কোণে ফেলে দিল শকুন্তলা। তারপর সে দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজল।

এখন শকুন্তলার চুলে হাত বুলিয়ে মান ভঞ্জন করা উচিত প্রবীরের শকুন্তলার চুল বব্ করা। তার পরিচ্ছন্ন ঘাড়ে বয়েসের রেখা এখনো বোঝা যায় না। হাউস কোটটা পরবার জন্য তার পিঠের শোভা আর এখন দেখা যাচ্ছে না।

প্রবীর কিন্তু শকুন্তলাকে স্পর্শ করল না। সে উঠে গিয়ে ছবির খাতাটা কুড়িয়ে এনে পাতা ওল্টাতে লাগল। এক একটা ছবি এক এক রকম। কোন ছবিই শকুন্তলার ঠিক নিজস্ব নয়, বিখ্যাত সব শিল্পীদের অনুকরণ। একটা বয়েসে সব শিল্পীই এ রকম করে। কপি করার ব্যাপারে শকুন্তলার বেশ দক্ষতা আছে।

একটু বাদে মুখ তুলল শকুন্তলা। তার চোখের পাতায় সামান্য জলের আভাস।

উদাসীন গলায় সে বলল, সেই সতেরো বছর বয়েসে, কী সুন্দর ছিল জীবনটা—

প্রবীর বলল, ঐ বয়েসটা তোমার খুব প্রিয় ?

তোমার প্রিয় নয় ? উনিশ বছর পর্যন্ত, যতদিন কোন পুরুষমানুষ আমায় এঁটো করে নি, ততদিন আমি কত পবিত্র, কত নির্মল ছিলুম ! ঠিক যেন একটা পাহাড়ী নদী…

পুরুষ তোমায় এঁটো করে নি। শরীর হচ্ছে অমৃত, তা কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। উচ্ছিষ্ট যদি কিছু হয়, তা হল মন। তুমি পুরুষদের নামে দোষ দিচ্ছ। কিন্তু তুমি পুরুষদের মনে মনে চাইতে না ? সব মেয়েই ঐ বয়েসে ভাবতে ভালবাসে যে কোন এক প্রিন্স চার্মিং আসবে, তার শরীর আদরে ভরিয়ে দেবে !

তুমি কী করে তা জানলে ? তুমি তো মেয়ে নও।

কবিরা সব জানে। এই অপার খলু সংসারে কবিরাই তো প্রজাপতি।

অনেক উচিংড়ে-মার্কা কবিও আমি দেখেছি। ও সব বাকতাল্লা ছাড় ! সতেরো বছর বয়েসটা তোমার কেমন লাগে ?

কৈশোর কিংবা প্রথম যৌবনের স্মৃতি আমার কাছে খুব একটা মধুর নয়। বেশ গরিব ছিলাম, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, সে সব বাদ দিলেও তখন অনুভূতি যেন তেমন তীক্ষ্ন ছিল না। বরং আমার মনে হয়, এই বয়েসেই পৃথিবীর রূপ-রস-সৌন্দর্য আমি অনেক বেশি উপভোগ করতে পারি, মানুষকে অনেক বেশি ভালোবাসতে পারি, মানুষের ভেতরের মানুষটাকে চিনতে পারি। অল্প বয়েসে, বিশেষত ছেলেরা, যেমন হুট করে পরের কথায় মেতে উঠে এক কথায় প্রাণ দিতে পারে, তেমনি আবার খুবই স্বার্থপরও হয়।

শকুন্তলা তৃষ্ণার্তের মতন এক চুমুকে এক গেলাস বীয়ার শেষ করে ফেলে বলল, আবার ভরে দাও ! অনেকদিন আমি এরকমভাবে কাজ থেকে ছুটি নিই নি। তুমি কি আমায় হিপনোটাইজ করেছ ?

হ্যাঁ করেছি।

তোমার ক'টি ছেলে মেয়ে, প্রবীর ?

আমি যে বিয়ে করেছি, সে কথা তো এখনো বলি নি।

তবে কি আল্লার ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

কবিদের স্ত্রী পুত্র পরিবার ঘর সংসার কিচ্ছু থাকতে নেই।

ফের আঁতলামি করছ ? শালা, তুই রবিঠাকুরের চেয়ে বড় কবি ? তাঁর ঘর-সংসার ছিল না ? তোর বাড়ি কোথায় বল আগে ?

এখনো বলার সময় হয় নি। আগে দ্বিতীয় স্বপ্নটার কথা মিটে যাক।

সেটা কখন শোনানো হবে?

হয়তো আজ আর হবে না।

সত্যি আমায় চোখে দেখার আগে তুমি আমায় নিয়ে দু' দুটো স্বপ্ন দেখেছ?

তৃতীয় স্বপ্ন দেখি কিনা তার জন্য কুড়ি পঁচিশ দিন অপেক্ষা করেছি। আর দেখি নি। আজ সকালে হঠাৎ মনে হল, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

আমার দু-একজন ছেলে বন্ধু বলেছে, তারা অল্প বয়েসে নাকি সিনেমার নায়িকাদের স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে তাদের উত্তেজনা হত। কিন্তু সে তো অল্প বয়সের ব্যাপার। তাছাড়া সিনেমার মেয়েছেলেদের যে সব জিনিস থাকে, তা আমার কিছুই নেই। আমার চেয়ে ভাল চেহারার মেয়ে তুমি ঢের দেখেছ!

দুটি স্বপ্নতেই আমি তোমায় খুব মন খারাপ অবস্থায় দেখেছিলাম।

খুব রেয়ার, খুব রেয়ার! আমার মন খারাপ সহজে দেখা যায় না।

কিন্তু স্বপ্নে আমি তাই-ই দেখেছি।

জানো, আমার যখন সতেরো বছর বয়েস, আমি খুব লাজুক ছিলুম তো তখন···

তুমি লাজুক ছিলে?

এখন বিশ্বাস করতে পারছ না তো? এখন অনেক পোড় খেয়ে ঝানু হয়েছি। কিন্তু সত্যিই আমি এক সময় খুব লাজুক ছিলুম, একদিন মনে আছে, আমার বাবা অন্যায় ভাবে আমায় বকুনি দিয়েছিলেন, অভিমানে-লজ্জায়-কান্নায় মিশে আমি কোন উত্তর দিতে পারি নি···সেইদিন আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, আমার বাবা খুব গরিব হয়ে গেছেন, ময়লা জামা কাপড় পরে একটা অফিসে চাকরি চাইতে গেছেন, আর আমিই সেই অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার···হাঃ হাঃ হাঃ···স্বপ্নে এমন সব গাঁজাখুরি ব্যাপার হয়! আশা করি ফ্রয়েডের বইতে এই সব স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা আছে। ফ্রয়েড তো সব ব্যাপারটাই রিপ্রেস্‌ড সেক্স বলে চালিয়ে দিয়েছে!

শকুন্তলা, তুমি একজন শিল্পী, তোমার মনে হয় না যে বড় বড় শিল্পীদের সব রচনাই স্বপ্নের মতন? সালভাদোর ডালির ছবিগুলো তো সবই আমার স্বপ্ন বলে মনে হয়।

ও ব্যাটা মহা শয়তান। ও শিল্পী নয়, ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কিংবা বলতে পারো শেয়ানা পাগল! ওসব কথা থাক। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে। তুমি তখন বলছিলে, অরিন্দমের ডিভোর্সের ব্যাপারে তোমার একটা ভূমিকা আছে···

অরিন্দম তাই মনে করে।

তুমি কুহুকে কত দিন ধরে চেনো?

ওর যখন সতেরো বছর বয়েস।

তুমিই ওর জীবনে প্রথম পুরুষ? আমি শুনেছিলুম যে বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে কুহুর খুব প্রেম ছিল। তারপর অরিন্দম এসে পড়ে, এক রকম কুহুকে ছিনিয়ে নিয়ে ওকে বিয়ে করে।

আমি কুহুর প্রেমিক ছিলুম না। বাদল রহমান আমার বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কুহু আমার বাড়িতে আসত। কিন্তু কুহুর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল। ও এমন ভাব দেখাত, যেন আমার প্রতিই ওর বেশী দুর্বলতা। এই জন্য অরিন্দম আর বাদল দুজনেই আমার ওপর চটা। কুহুর এই ব্যবহারের আমি মানে বুঝতে পারি নি।

হয়তো তোমাকেই কুহুর বেশী পছন্দ ছিল। তুমি বুঝতে পারো নি।

না, সেটুকু বোঝার মতন বুদ্ধি আমার আছে। কুহু সাবধানী মেয়ে, সে জানে, আমার মতন পুরুষের ওপর কখনও নির্ভর করা যায় না।

কেন?

আমি সেই রকমই।

তুমি শুধু মধু খেতে জানো? এই যে একটু আগে বললে, কবিরা প্রজাপতি না কী যেন হয়।

সে প্রজাপতি মানে অন্য।

জ্ঞান দিও না। তা আমি জানি। তুমি বলতে চাও, তুমি কুহুকে নিয়ে কিছু কর নি?

এটা জানা তোমার খুব দরকার?

হ্যাঁ।

অরিন্দমের সঙ্গে ঝগড়া করে কুহু একদিন আমার কাছে চলে এসেছিল। হয়তো এসেছিল বাদলের জন্যই, কিন্তু বাদল তখন কুয়াইত গেছে। কুহু অবশ্য এমন ভাব দেখাল যে ও আমার কাছে আশ্রয় নেবার জন্যই এসেছে। আমি কুহুর সঙ্গে অত্যন্ত মধুরভাবে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলুম।

কী করেছিলে?

সেটা তুমি শুনবেই?

হ্যাঁ।

সে রাতে আমি খুব ড্রাঙ্ক ছিলুম, আমি কুহুকে আমার বিছানায় নিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর ঐ ব্যাপারটা হয়ে যাবার পর আমি টেলিফোনে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে প্রেমের কথা বললুম। কুহু তখনও পাশে শুয়ে। কুহু তার রূপ দিয়ে আমায় ভোলাতে চেয়েছিল, আমি তাকে আমার মন দেব কেন ?

বেশ করেছ !

কুহুর ওপর তোমার রাগ আছে দেখছি !

হ্যাঁ আছে। কেন জানো ? কোন পুরুষমানুষ ঘটিত কারণে নয়। আমি এক সময় কুহুকে খুব পছন্দ করতুম। আমি তার একটি মূর্তি গড়ার জন্য ওকে ন্যুড মডেল হতে বলেছিলুম। কুহু তো রাজি হলই না, বরং রেগে গেল। আমি নাকি তাকে অপমান করেছি। আরে গেল যা! অত রূপ নিয়ে জন্মেছিস, সেই রূপ যদি শিল্পের প্রয়োজনে না লাগে, তাহলে ঐ রূপের মানে কী ? সে তোমার মতন একজন পর পুরুষের সঙ্গে যখন ঐ ব্যাপারটা করেছিল, তখন নিশ্চয়ই জামা-কাপড় সব খুলেছিল। আর আমার সামনে খুলতে পারে না ? একে ন্যাকামি ছাড়া আর কী বলব ?

কিন্তু ওরকম মূর্তি গড়া মানে তো, সবাইকে জানিয়ে দেওয়া।

সো হোয়াট ?

তোমার কাছে পোজ দিতে রাজি না হয়ে কুহু বোকামিই করেছে। ওর রক্ত-মাংসের রূপ অমর হতে পারত।

যাক গে যাক, চুলোয় যাক। বাদল রহমানকে বিয়ে করে কুহু সুখে থাকুক। তিন চারটে কাচ্চা বাচ্চা হোক! আর বীয়ার আছে ?

আর একটা বোতল আছে।

দাও, আমায় দাও। খাবার-দাবার তো কিছুই খেলে না।

আমার ঘুম পাচ্ছে।

তুমি ঘুমোবে ?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি চলে যেও না।

আমি আরও···মানে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমি বসে থাকব ?

হ্যাঁ, থাকবে। এই আমার অর্ডার।

পর পর দু' গেলাস বীয়ার লম্বা চুমুক দিয়ে শেষ করে শকুন্তলা যেখানে বসে ছিল সেখানেই গা এলিয়ে দিল। তার মাথাটা এসে পৌঁছল প্রবীরের উরুর

প্রায় কাছে। প্রবীর কিন্তু শকুন্তলার মাথা রাখবার জন্য নিজের উরু এগিয়ে দিল না।

তার বদলে প্রবীর বলল, শকুন্তলা, তোমার ঘুম পেয়েছে, তুমি ওপরে গিয়ে শোও, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

শকুন্তলা জড়ানো গলায় বলল, কেন রে, শালা! এটা তোর বাড়ি না আমার বাড়ি? আমার যেখানে ইচ্ছে সেখানেই শুয়ে থাকব।

জ্বলন্ত সিগারেটটা হাত থেকে খসে পড়ল শকুন্তলার। সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রবীর সিগারেটটা তুলে রাখল অ্যাসট্রেতে। তারপর কিছুক্ষণ সে একেবারে নিথর হয়ে বসে রইল।

সারা বাড়ি একেবারে নিঝুম। শম্ভু কোথায় থাকে কিংবা বাড়িতেই আছে কি না তা বোঝবার উপায় নেই। দরজাটার এক পাল্লা ভেজানো।

প্রবীরের সামনে ঈষৎ নেশাগ্রস্ত এক রমণী শুয়ে আছে। হাউস কোটের বোতাম আঁটেনি শকুন্তলা, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার ব্রা। প্রবীরে সামনে, বলতে গেলে, এক কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এ পরীক্ষায় সে অনায়াসে পাশ করবে। আজকের দিনটা তো অন্য কোন দিনের মতন নতন নয়। আজ সে অন্য মানুষ।

সাধক-টাধকরা যেমন যুবতী নারী সামনে রেখেও সংযমের ঘটা করে, প্রবীরেরও যেন সেই রকম অবস্থা। এই কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল তার। প্রবীর মজুমদার একজন সাধক। এর চেয়ে হাসির কথা আর হয় না।

একটু বাদেই পাখা থেমে গেল।

প্রবীর ঘড়ি দেখল। পৌনে চারটে বাজে। কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে। লোড শেডিং বেশীক্ষণ থাকলে এখানে বসে থাকা অসহ্য হবে।

পাখার হাওয়া থেমে গেছে বলেই কোথা থেকে একটা মাছি চলে এসেছে। সেটা অবাধ্যের মত ভন্ ভন্ করছে শকুন্তলার মুখের ওপর।

হাত দিয়ে মাছিটাকে তাড়াতে গিয়ে একবার শকুন্তলার ঠোঁটে আলতো ভাবে হাত লেগে গেল প্রবীরের। কিন্তু শকুন্তলার ঘুম ভাঙে নি।

তখন একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পেয়ে গেল প্রবীরের। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে এই রকম একটা দৃশ্য আছে না? একটা ভ্রমর উড়ছিল শকুন্তলার মুখের সামনে, যেন সে শকুন্তলার ওষ্ঠে চুম্বন করতে চাইছে। তা দেখে

রাজা দুষ্মন্তের মনে হল, ঐ ভ্রমরটা তার চেয়েও ভাগ্যবান। এ যে প্রায় সে রকম অবস্থা !

প্রবীর ভাবল, আর যা-ই হোক, সে রাজা দুষ্মন্ত নয়। তবু। শকুন্তলার এতখানি সান্নিধ্যে বেশীক্ষণ বসে থাকা যাবে না।

শকুন্তলা ইচ্ছে করেই খারাপ কথা বলে, অনেকটা পুরুষালি ব্যবহার করে যেন প্রমাণ করতে চায় যে সে পুরুষদের সঙ্গে সমান। কিন্তু তার ঘুমন্ত মুখখানিতে ফুটে উটে উঠেছে অসহায় সারল্য।

শকুন্তলা তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। তা বলে যে প্রবীরকে থাকতেই হবে, এমন কোন ব্যাপার নেই। আজ সে অন্য কারুর ইচ্ছে অনিচ্ছে অনুসারে দিন কাটাবার জন্য এখানে আসে নি। আজ সে এসেছে সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে।

মেয়েটার সাহস আছে বলতে হবে। অমন নিশ্চিন্ত ভাবে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল ? দু-আড়াই বোতল বীয়ার খেয়ে এতটা নেশা ? প্রবীর যদি সত্যিই কোন প্রতারক হত, তাহলে তো সে এই সুযোগে শকুন্তলার যথাসর্বস্ব, এমন কি নারীত্ব পর্যন্ত লুটেপুটে নিয়ে যেতে পারত।

স্টুডিও ঘরটার বাইরে বেরিয়ে এলো প্রবীর।

বাইরে বেশ লম্বা টানা বারান্দা। এক কোণে বাথরুম, অন্য কোণে রান্নাঘর। স্টুডিও ঘরের পাশে আর একটি তালাবন্ধ ঘর।

শম্ভুর কোন পাত্তা নেই।

প্রবীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়। এক পাশে ছোট্ট ছাদ। অন্য পাশে পাশাপাশি দুখানি ঘর। এখানে প্রত্যেক ঘরের দরজা খোলা। এর মধ্যে একটি শকুন্তলার শয়নকক্ষ নিশ্চয়ই।

দুটি ঘরেরই দরজা খুলে বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখল প্রবীর। একটা ঘর বইপত্রে ঠাসা। অন্য ঘরটিতে বিখ্যাত সব শিল্পীদের আত্ম-প্রতিকৃতির ছবি অথবা তাঁদের চেহারার প্লাস্টার কাস্টিং। এখানেই তাহলে শকুন্তলা শোয়, সে রাত কাটায় এই সব বিখ্যাত লোকদের সংস্পর্শে।

প্রবীর কিন্তু সে ঘরে ঢুকল না। বরং সে বইয়ের ঘরে ঢুকে পড়ল।

তিনতলায় একটি ঘর আছে। সেটি নিশ্চয়ই শকুন্তলার প্রাক্তন স্বামী অর্থাৎ এ বাড়ির মালিকের। বিচিত্র সব ব্যাপার।

বইয়ের র‍্যাকে চোখ বুলোতে বুলোতে এক জায়গায় প্রবীরের চোখ আটকে

গেল। কহ্‌লিল জিব্রানের একটি চিঠিপত্রের সংকলন। মেরি হ্যাসকেলকে লেখা। এই বইটার কথা প্রবীর শুনেছে, কিন্তু আগে দেখে নি।

বইটি টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রবীর বিভোর হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ফেলল খানিকটা। তারপর এক সময় বইটি নিয়ে নিচে নেমে এলো। স্টুডিও ঘরে ঢুকল না, বসে পড়ল বাইরের বারান্দায়।

প্রবীরের মনে হল, শকুন্তলার ঘুমের সুযোগ নিয়ে যদি কিছু চুরি করতে হয়, তাহলে এই বইটা।

বইটা যদি এখানে পড়া শেষ না হয়, তাহলে প্রবীর নিশ্চয়ই বাড়িতে নিয়ে যাবে।

খুব বেশিক্ষণ বসতে পারল না প্রবীর। আলো কমে এলো। সন্ধ্যে হয় নি, কিন্তু আকাশ অন্ধকার। কালো মিশমিশে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। তারপরই চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। সেই সঙ্গে গরগর গর্জন।

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে প্রবীর দেখল, শকুন্তলা একই রকম ভাবে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এখন ওকে ডাকবারও কোন মানে হয় না।

খুব জোরে একবার বজ্রপাত হতেই সেই আওয়াজে জেগে উঠল শকুন্তলা। বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে?

প্রবীর বলল, সাড়ে পাঁচটা।

দারুণ চঞ্চল হয়ে শকুন্তলা বলল, কী সর্বনাশ! তোমার সঙ্গে বকবক করে আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম, আমার দারুণ কাজ আছে।

প্রবীর বলল, তুমি প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছ। আমার সঙ্গে বকবক তো কর নি!

আমার আজ পাঁচটার সময় প্রীতি হালদারের বাড়ি যাবার কথা। দুজন সাহেব আসবে ওখানে।

আকাশের যা অবস্থা, এখন যেতে পারবে কি?

আমায় যেতেই হবে। এই তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?

প্রবীর দু'দিকে মাথা নাড়ল।

তোমার দ্বারা কোন উপকার হবে না, তা আমি জানতুম। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারবে অন্তত? শম্ভু হতচ্ছাড়াই বা গেল কোথায়?

আজ আর এখন তোমার যাওয়া হবে না, শকুন্তলা।

আলবৎ যাব!

শকুন্তলা দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একদল

অশ্বারোহীর মতন এসে পড়ল প্রবল বৃষ্টি। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে পোশাক পাল্টে শাড়ি পরে নেমে এলো শকুন্তলা। কোন মেয়ের পক্ষে এত দ্রুত বেশ পরিবর্তন প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কোন রকম প্রসাধন করে নি শকুন্তলা। মাথার চুলও আঁচড়ায় নি।

নিচে নেমে এসে সে বলল. চল!

প্রবীর জিজ্ঞেস করলে. এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি কি করে যাবে?

যেতে আমাকে হবেই। প্রীতিকে আমি কথা দিয়েছি।

বৃষ্টিতে ভিজতে আমার অসুবিধে নেই। কিন্তু তোমার ছাতা লাগবে না?

গুলি মারো ছাতা-ফাতা!

সদর দরজা খুলে বাইরে বেরুবার পর শকুন্তলা বলল, শম্ভু যদি চাবি নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ভেতরে ঢুকতে পারে। নইলে থাকুক বাইরে বসে।

শকুন্তলাদের বাড়ি একটু গলির মধ্যে। সেখান থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত আসতেই দুজনে ভিজে চুপসে গেল। এই সময়ে ট্যাক্সি ধরাও একটা অসাধ্য কাজ।

রাস্তায় বলতে গেলে একটাও মানুষ নেই, এখন সব কিছুই বৃষ্টির অধিকারে। আর মিনিট পাঁচেক এরকম বৃষ্টি হলেই এই সব রাস্তা নদী হতে শুরু করবে। ভবানীপুরের এই পাড়াটা জল জমার জন্য বিখ্যাত।

কত দূরে যাবে তুমি?

তালতলায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছেই।

কোন মিনিবাসও তো সরাসরি ঐ রুটে যায় না।

এসপ্লানেড থেকে বদলে যাব। হয়তো ওদিকে বৃষ্টি হচ্ছে না।

পাতাল রেলের কাজের জন্য এ রাস্তা থেকে ট্রাম লাইন উঠে গেছে। মিনি বাসও দেখা যাচ্ছে না।

আজ তুমি যেতে পারবে না, শকুন্তলা, অসম্ভব ব্যাপার।

তুমি কেটে পড় তো! আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করবই।

প্রবীর শকুন্তলার একটা হাত ধরলো। বৃষ্টি ক্রমশই বাড়ছে, শকুন্তলার দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে। তবু শকুন্তলা এমনভাব করছে যে বৃষ্টির কথা তার মনেই নেই। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে কোন যানবাহন।

প্রবীর বলল, শকুন্তলা, চলো ফিরে যাই।

শকুন্তলা বললো, না। তোমায় তো আসতে বলি নি আমার সঙ্গে। তুমি চলে যাও না!

তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিই কী করে? একদম ভিজে গেছ!

ইস্! অন্য দিন আমায় কে দেখতে আসে? ঐ যে বাস আসছে।

একতলা একটা সরকারী বাস আসছে খুব মন্থর গতিতে। গাড়িবারান্দা ছেড়ে শকুন্তলা দৌড়ে মাঝরাস্তায় বাসটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর দুজনেই বলে উঠল, যাবে না, এ বাস যাবে না!

কে শোনে কার কথা। প্রায় জোর করেই উঠে পড়ল শকুন্তলা।

অন্য দরজা দিয়ে প্রবীরও উঠে পড়েছে।

বাসটা সম্পূর্ণ খালি। দুই কণ্ডাক্টরই বলল, এ বাস খারাপ হয়ে গেছে, আমরা এতে লোক তুলছি না।

শকুন্তলা বলল, খারাপ হলেও চলছে তো দেখছি ঠিকই।

কণ্ডাক্টর বলল, ফার্স্ট গীয়ার ছাড়া অন্য কিছু নিচ্ছে না। তাই কোনরকমে নিয়ে যাচ্ছি। যদি গ্যারাজ পর্যন্ত পেঁছোন যায়।

প্রবীর বলল, শুধু ফার্স্ট গীয়ারে চালিয়ে ইঞ্জিনের তো বারোটা বেজে যাচ্ছে।

কণ্ডাক্টর বলল, সে আমরা কী করব!

গ্যারাজ কোথায়?

হাওড়া।

শকুন্তলা বাচ্চাদের মতন খুশি হয়ে বলল, যাক, এ বাসে আমাদের ভাড়া লাগবে না। আপনারা হাওড়া যাবেন তো, আমরা মাঝপথে—কোথাও নেমে যাব।

প্রবীরের পাশে বসে পড়ে শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি উঠে পড়লে যে? তুমি কোথায় যাচ্ছ?

তোমার সঙ্গে।

তোমাকে আমি মোটেই প্রীতিদের বাড়িতে নিয়ে যাব না!

সে বাড়িতে আমি যাবও না। একদিনে দুজন মহিলার সঙ্গে পরিচয় করা আমার ধাতে সইবে না। আমি তোমাকে শুধু তালতলা পর্যন্ত পেঁছে দেব। যদি পেঁছান যায়।

ইস, ভিজে একেবারে জুবজুবে হয়ে গেছি। প্রীতির বাড়িতে পেঁছে আমি

না হয় ওর শাড়ি-টাড়ি চেয়ে পরে নেব। তুমি কী করবে? তোমার ঠিক নিউমোনিয়া হবে।

তাহলে তুমি সেবা করবার জন্য যাবে আমার কাছে।

আমি এখনও তোমার ঠিকানাই জানি না! তুমি মানুষ না ভূত, তাও জানি না।

আমার নাম যখন জেনেছ, তখন ঠিকানাও জানতে পারবে এক সময়।

শকুন্তলা একদৃষ্টিতে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, তুমি সত্যি বলছো, তুমি আমায় স্বপ্ন দেখেছিলে? ওয়েস্ট জার্মানিতে···সেই হোটেলের কাছে নদীর ধারে·· অনেক রাত তখন···আমায় আর কেউ দেখে নি, কেউ জানে না।

শকুন্তলা, এখনো যেন তোমায় স্বপ্নের মধ্যে দেখছি···

বাইরে বৃষ্টি এমন ধেয়ে ধেয়ে আসছে যে মনে হয় যেন আজই প্রলয় হবে। অনেকদিন বাদে স্নান করছে এই শহর। মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে খুব তেজী বজ্রপাতের শব্দ।

শকুন্তলা বলল, এক সময় এই বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে হেঁটে বেড়াতে কী ভালই লাগত। এখন বয়স হয়ে গেছে—

প্রবীর বলল, এখনও আমাদের তেমন বয়েস হয় নি।

তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কথা আলাদা। আমি চল্লিশ বছরের বুড়ি।

তোমার বয়স আটত্রিশ। আমার কি ধারণা জানো, সাঁইত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ, এটাই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। মেয়েদেরও ছেলেদেরও।

কেন?

যার যা কাজ, সেটা সবচেয়ে বেশি ভাল করা যায় এই বয়েসেই। পৃথিবীকে উপভোগ করাও যায় সবচেয়ে বেশি করে।

তোমার বয়েস বুঝি সাতচল্লিশ?

না, আটচল্লিশ। একটু রং সাইডে পড়ে গেছি।

তোমার বয়েসটা অত মনে হয় না। এখনও বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

যাঃ! মেয়েদের মুখ থেকে এরকম কথা শুনলে ভাল লাগে।

যখন আমাদের বয়েস অনেক কম ছিল, তখন চল্লিশ বছর বয়েস শুনলে ভয় করত, না? মনে হত, চল্লিশ বছর মানে তো বুড়ো। এখন কিন্তু চল্লিশ

বছরটাকে অত কিছু ভয়ের মনে হয় না। আগে যা পারতুম, এখনও তা তো সবই পারি।

তুমি ভাবছ চল্লিশের কথা, আমি ভাবছি পঞ্চাশের কথা। পঞ্চাশও এমন কিছু খারাপ নয়।

এলগিন রোডের কাছে বেশ জল জমে গেছে। বাসটা ধকধক শব্দ করে থেমে থেমে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

প্রবীর বলল, ফার্স্ট গীয়ারে এতক্ষণ চলছে, এ গাড়ির ভাগ্য খুব খারাপ। কোথায় যে খতম হবে তার ঠিক নেই। এখানে নেমে পড়লে রিক্‌শা চেপে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।

দেখাই যাক না কত দূর যাওয়া যায়।

ধন্য তোমাদের সাহেবপ্রীতি। তোমরা শিল্পীরা সাহেবদের নাম শুনলেই লালায়িত হয়ে ওঠ। সাহেব আসছে বলে ঝড়জলের মধ্যে ছুটে যেতেই হবে।

কবিদের বুঝি সাহেবপ্রীতি নেই।

সাহেবরা বাংলা কবিতা পড়ে না, সেই জন্য কবিরাও সাহেবদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। কিন্তু শিল্পীদের কথা আলাদা। কোন সাহেব একটু প্রশংসা করলেই…

চুপ কর।

অপ্রিয় সত্য বলতে নেই, তাই না?

প্রীতির বাড়িতে যে দুজন সাহেব আসছে, তাদের মধ্যে একজন প্রীতির ছোট বোনকে বিয়ে করেছে। বিলেতে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এক সময়। আর একজন শুনেছি নাম-করা সায়ান্টিস্ট। এরা কেউ আমার স্কাল্পচার দেখে নি, কখনো দেখবার সম্ভাবনাও নেই। প্রীতিকে কথা দিয়েছি বলেই আমি যাচ্ছি। কথা রাখা আমার স্বভাব।

দেখেছ, ময়দানে দুটো গাছ ভেঙে পড়েছে? এদিকে ঝড়ও হয়েছে খুব।

তুমি লক্ষ রেখ, যদি কোন ট্যাক্সি চোখে পড়ে আমরা ঝুপ করে নেমে পড়ব।

কিন্তু কোন ট্যাক্সিওয়ালাই এই সময় ময়দানে ফাঁকা জায়গায় থেমে থাকে না। বাজ পড়ার ভয় আছে। বৃষ্টি কমবার একটুও লক্ষণ নেই।

মহাযুদ্ধের সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের কাছ দিয়ে বেঁকতে গিয়েই বাসের তলায় মড়মড় শব্দ হল। তারপর বাসটি একেবারেই থেমে গেল।

কণ্ডাক্টর দুজন বলল, যাঃ!

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, এখন আপনারা কী করবেন ?

বাসের মধ্যেই বসে থাকব। এই বৃষ্টির মধ্যে আর কী করা যাবে ?

প্রবীরের দিকে ফিরে শকুন্তলা বলল, আমরাও কি বাসের মধ্যে বসে থাকব নাকি ? চল, নামি !

একজন কণ্ডাক্টর বলল, দিদি, এই এত বৃষ্টি, এর মধ্যে নামবেন না। একটু অপেক্ষা করুন—

কিন্তু শকুন্তলা সে কথায় কর্ণপাত করল না।

দুজনে গিয়ে দাঁড়াল শহীদ স্তম্ভটির গা ঘেঁষে। কিন্তু তাতেও বৃষ্টি থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই।

শকুন্তলা বলল, ভিজতে যখন কিছু বাকি নেই, তখন চল হাঁটতে শুরু করি।

কোন্ দিকে ?

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, তুমি হাঁটতে রাজি নও ?

প্রবীর বলল, হ্যাঁ, রাজি। কিন্তু কোন্ দিকে ? নদীর দিকে না শহরের দিকে ?

শকুন্তলা যেন দারুণ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। সে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী বললে প্রবীর !

প্রবীর মুখে সামান্য হাসি রেখে বলল, তুমি হাঁটতে চাইলে, তাই আমি জিজ্ঞেস করলুম, কোন্ দিকে ? নদীর দিকে, না শহরের দিকে ? হাঁটার পক্ষে তো নদীর ধারই ভালো, তাই নয় ?

শকুন্তলা বলল, তুমি গঙ্গার দিকে যেতে চাও ? সে কথা আগে বল নি কেন। চল—

সত্যি যাবে ? প্রীতির বাড়িতে যে সাহেব এসেছে—

ও প্রসঙ্গ একদম বন্ধ। মনে কর, আমার বয়েস আঠারো, আর তোমার বয়েস একুশ। আমরা লুকিয়ে প্রেম করতে বেরিয়েছি। তাহলে গঙ্গার ধার তো আদর্শ জায়গা। বৃষ্টির সময় ফাঁকাও হবে। আমার হাত ধর।

শকুন্তলার একটা করতল প্রবীর নিজের মুঠোয় ধরে পা বাড়াল।

শকুন্তলা বলল, আমাদের ব্যস্ততা কিছু নেই, বৃষ্টি থেকে গা বাঁচাবারও দরকার নেই, আমরা আস্তে আস্তে হাঁটব।

জনশূন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল দুজনে। প্রথমে কিছুক্ষণ নিঃশব্দ।

একটু পরে প্রবীর জিজ্ঞেস করল, এই রকম সন্ধ্যেবেলা তুমি শেষ কবে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছ ?

শকুন্তলা বলল, মনেই পড়ে না। আমার মেয়ে যখন খুব ছোট ছিল, তখন ওকে নিয়ে কয়েকবার এসেছি।

কোনো পর পুরুষের সঙ্গে আর আসো নি?

না। তুমি বুঝি প্রায়ই আসো?

আমার সন্ধ্যেগুলো আমার বন্ধু-বান্ধবরা নিয়ে নেয়। কখনো কখনো গভীর রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে আসি গঙ্গার ধারে, মদ খাওয়ার জন্য।

আজ তোমার একুশ বছর, আমার আঠারো বছর।

শকুন্তলা, উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপছে।

কেন?

আমি ঠিক একুশ বছর বয়েসীই হয়ে গেছি। সব কিছুই অবিশ্বাস্য লাগছে। তুমি আমায় বিশ্বাস করবে বল?

শকুন্তলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারি? কোনো সতেরো বছরের মেয়ে যদি কোনো একুশ বছরের ছেলের হাত ধরে নদীর ধারে বেড়াতে আসে, তা হলে সে কি আর ঐ ছেলেটিকে অবিশ্বাস করতে পারে? আমার যখন সতেরো বছর বয়েস ছিল⋯⋯

প্রবীর বললো, আমার যখন একুশ বছর বয়েস ছিল⋯

তুমি কি বলবে বলছিলে?

এক্ষুনি বলবো, কিন্তু আমার বুক কাঁপছে।

কী ব্যাপারটা কি?

তুমি আমায় মিথ্যেবাদী ভাববে না?

আগে বলো কি হয়েছে?

মানুষের জীবনের সবচেয়ে ভালো ব্যাপার কি জানো? অনিশ্চয়তা!

কিংবা আজকেই এক ঘণ্টা বাদে কি ঘটবে তা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। অনেক কিছু অলৌকিকের মতন ঘটে যায়। আজ আমার জীবনে সেই রকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে এক্ষুনি। যা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

কি ঘটতে যাচ্ছে?

আর একটু ধৈর্য ধর। এই যে এসে গেছি প্রায়, এবার রাস্তা পার হতে হবে, খুব সাবধানে, এর মধ্যে যদি কেউ গাড়ি চাপা পড়ি, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

কোথাও কোন গাড়ির চিহ্ন নেই। অবু শকুন্তলার হাত ধরে

প্রবীর খুব সতর্কভাবে রাস্তা পার হল।

আউট্রাম ঘাটের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধারের রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে প্রবীর বলল, তাহলে সত্যিই হল!

শকুন্তলা কাছাকাছি একটা ছাউনির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, চল, ওখানে গিয়ে দাঁড়াই। আমার ব্যাগে সিগারেট আছে, তোমাকে

প্রবীর বলল, দাঁড়াও আগে তোমায় দ্বিতীয় স্বপ্নটার কথা বলে নিই।

দ্বিতীয় স্বপ্ন? হ্যাঁ, বল

শকুন্তলা, তুমি একটা ধাক্কা দাও তো আমাকে আমি কি সত্যিই নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আছি তোমার সঙ্গে।

কী পাগলামি হচ্ছে?

আমি এখানে স্বপ্ন দেখছি না তো!

প্রবীর তোমার দ্বিতীয় স্বপ্নটা এবার বলো। কী দেখেছিলে?

ভয়ের কিছু?

প্রথম স্বপ্নটা দেখেছিলুম, সেই জার্মানিতে একটা না-জানা নদীর ওপর দিয়ে তুমি খালি পায়ে হাঁটছ, তোমার খুব মন খারাপ··· আর দ্বিতীয় স্বপ্নটাতেও তোমাকে দেখি আর একটা নদীর ধারে, সেটা চিনতে পেরেছিলাম, এই গঙ্গা। বৃষ্টি পড়ছিল তবে এত জোরে নয়, টিপটিপ করে, তুমি আমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললে, প্রবীর, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

শকুন্তলা স্থির দুই চোখে তাকিয়ে আছে প্রবীরের দিকে। তার সমস্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির জল। শাড়ি সম্পূর্ণ ভিজে গিয়ে লেগে আছে গায়ের সঙ্গে। স্পষ্ট লবে উঠেছে তার নিজেরই ভাস্কর্যের মতন বুক ও কোমরের খাঁজ।

প্রবীর বলল, সেই স্বপ্ন যে আজই সত্যি হয়ে উঠবে, আমি কল্পনাও করিনি। তুমি যে বাড়ি থেকে বেরুতে চাইবে, এরকম বৃষ্টি··· সবই যেন অলৌকিক ভাবে ঘটে গেল।

শকুন্তলা তবু স্থির চোখে দেখছে প্রবীরকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, সত্যি প্রবীর, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অনেক অনেক কথা···তুমি চলে যাবে না তো?

প্রবীর দু'হাত বাড়িয়ে শকুন্তলাকে বুকে টেনে নিল। তাকে জড়িয়ে ধরল প্রবলভাবে। তারপর গঙ্গা নদীকে সক্ষী রেখে সে শকুন্তলার ওষ্ঠ চুম্বন করল। অনেকক্ষণ।

এখন কেউ কোন কথা বলবে না।